Registered

মূল্য ঃ পাঁচ টাকা

''সমস্ত দেশের, বিশেষ করে ভারতবর্ষের ঘটনা সাক্ষ্য দেয় ধর্মই মানুষকে পতিত, দাস, উপেক্ষিত এবং ঘৃণাস্পদে পরিণত করেছে। ভারতীয় মানবতাকে ছিন্ন ভিন্ন করার জন্য কোন কিছুর যদি বেশি নষ্টামি থাকে তবে তা ধর্মের।''

—রাহুল সাংকৃত্যায়ন

গণবার্তা

সূচি..... পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয় ১
গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক মূল্যবোধ সমূলে ধ্বংস..... ১
দেশে-বিদেশে ২
তিস্তার গ্রেপ্তার, আজকের ভারত ৩
তিস্তা শেতলবাদের উপর আক্রমণ...৪
বাবাসাহেব আম্বেদকর ৫
অগ্নিপথ : বেসরকারিকরণের পথে
কর্পোরেটতন্ত্র কায়েমের প্রকল্প ৭
প্রসঙ্গ : ইউক্রেন নিয়ে জুয়া খেলা..৮
চা বাগানের শ্রমিকদের চিঠি ৮

70th Year 17th Issue ★ Kolkata ★ Weekly GANAVARTA ★ Saturday 25th June & 2nd July 2022 [Joint Issue]

সম্পাদকীয়

কলোম্বিয়ার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নতুন যুগের সূচনা

দু'হাজার সালে এবং পরবর্তীতে লাতিন আমেরিকায় একের পর এক আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল এবং জনজাতি সংখ্যাধিক বেশ কিছু দেশে বামপন্থী সরকার শাসনক্ষমতা দখল করেছিল। বিগত দিনে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের তথাকথিত সমাজতন্ত্রের পরীক্ষা নিরীক্ষা ব্যর্থ হবার বেদনার ওপর প্রলেপ হয়ে সমাজতন্ত্রে প্রত্যয়ী মানুষের কাছে আবার একুশ শতকের সমাজতন্ত্র আভাসিত হচ্ছিল। সেই সময়েও ভেনেজুয়েলার প্রতিবেশী কলোম্বিয়া ড্রাগ মাফিয়া অধ্যুষিত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির শক্ত ঘাঁটি হয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কনিষ্ঠ অনুচরের ভূমিকায় শাসন ক্ষমতা দখল করে রেখেছে। তাই কলোম্বিয়ার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এবার প্রাক্তন গেরিলা বাহিনী কলোম্বিয়া সশস্ত্র বিপ্লবী বাহিনীর নেতা গুস্তাভো পেট্রোর জয় লাতিন আমেরিকার গণতান্ত্রিক সংগ্রামের অভিমুখে অবশ্যই এক ইতিবাচক ঘটনা। সমস্ত বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিনিধি গুস্তাভো পেট্রো তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দক্ষিণপন্থী রোনাল্ডো হার্নান্ডেজকে তিন শতাংশেরও বেশি ভোটে পরাজিত করেন। মার্কিন ডলার আর ড্রাগ পাচার থেকে উপার্জিত ডলার সহ কর্পোরেট প্রচার মাধ্যমের বিরুদ্ধে কার্যত কঠিন লড়াই করে পেট্রোকে জিতিয়েছেন কলোম্বিয়ার গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষ। পেট্রো জানেন ভয়ঙ্কর বেকারত্ব এবং মুদ্রাস্ফীতি সহ ৪০ শতাংশ মানুষের দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই কঠিনতম কাজ যেখানে, সংসদে এখনো ৮০ শতাংশ প্রতিনিধি দক্ষিণপন্থী। তাছাড়া লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক আজ ড্রাগ পাচার ও বিপণনে দুর্বৃত্ততন্ত্রের শরিক। এটাই তাদের জীবন জীবিকা। অমেরিকা সর্বদা কলোম্বিয়ায় ঘাঁটি স্থাপন করে অতীতে বহুবার ভেনেজুয়েলার ওপর সন্ত্রাসী হামলার ষড়যন্ত্র করেছে। শুধু তাই নয়, ভেনেজুয়েলা-কলোম্বিয়া সীমান্ত জুড়ে ড্রাগের ব্যবসা চালু রেখেছে এবং ভেনেজুয়েলার মাদুরো সরকারবিরোধী গোষ্ঠীগুলিকে ক্রমাগত উসকে দিয়েছে।

সুতরাং ধারাবাহিকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থার মধ্যে চলতে অভ্যস্ত প্রশাসনকে স্রোতের বিপরীতে চালিত করার কঠিনতম দায়িত্ব নিতে হবে পেট্রোর সরকারকে।

পেট্রো এবং কলোম্বিয়ার খেটেখাওয়া মানুষের আশা সেখানকার সর্বজনীন উন্নয়নের কর্মসূচি সফল করতে তাঁদের পাশে এসে দাঁড়াবে কিউবা ভেনেজুয়েলার মতো বামপন্থী দেশগুলো। অবশ্যই লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের যৌথ উদ্যোগে গঠিত বিশ্বব্যাঙ্ক ও আই এম এফ বিরোধী অর্থনৈতিক সংস্থাসমূহ। কলোম্বিয়ার স্থায়ী উন্নয়ন, শিক্ষা স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতিকল্পে এগিয়ে আসবে।

আমেরিকায় আইনকানুন সর্বনেশে

সম্প্রতি আমেরিকার শীর্ষ আদালতের সারা দেশে গর্ভপাত বিরোধী রায়ে বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ স্তম্ভিত ও ব্যথিত। আমেরিকার মতো প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানচর্চায় তথাকথিত উন্নত দেশের রাজনৈতিক এবং বিচারব্যবস্থার নৈতিক এবং মানবিক মূল্যবোধ যে এখনো মধ্যযুগীয় সামাজিক উপরিকাঠামোর মধ্যে বন্দি, তারই সাক্ষ্য এই আইন। প্রতিক্রিয়ার এই ধরনের উগ্র অভিমুখ গণতান্ত্রিক সংবিধানের স্তম্ভগুলিকে বিকৃত করে ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা কায়েম করে। কোথাও সংসদীয় সংখ্যা গরিষ্ঠতার, কোথাও প্রশাসন বা সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে, কোথাও বা বিচার ব্যবস্থাকে অতি সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করে নাৎসি জার্মানিতে গর্ভনিরোধক আইন প্রচলিত হয়েছিল ১৯৪৩ সালে। একমাত্র ছাড় দেওয়া হয়েছিল রাষ্ট্রের সংজ্ঞা অনুযায়ী অশুদ্ধ জাতির সঙ্গে সংসর্গে সন্তান হলে। অর্থাৎ সেই সন্তানকে হত্যা করতেই হবে। এভাবেই চরম দক্ষিণপন্থী, গণতন্ত্র ধ্বংসকারী পথ গ্রহণ করছে আমেরিকা। ফ্যাসিবাদী সমাজ গঠনের লক্ষ্যে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। ইতিমধ্যে কয়েকটি রাজ্যে এই আইন কার্যকর হয়েছে। এই আইনে যারা গর্ভপাতের সুপারিশ বা সহযোগিতা করবে এবং যে চিকিৎসক প্রসূতির গর্ভপাত করাবে, তাদের শুধুই জরিমানা নয়, কারাদন্ড দেওয়া হবে। নিজের দেশে অন্তত গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য বজায় রেখে দেশে দেশে গণতন্ত্র ধ্বংস করতে সিদ্ধহস্ত আমেরিকা। আজ নিজের দেশেই গণতন্ত্র ধ্বংসের পথে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে আমেরিকা। লজ্জার বিষয় বিচার ব্যবস্থাই মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে।

গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক মূল্যবোধ সমূলে ধ্বংস করতে মোদী সরকার তৎপর

গত ১৫ জুন, ২০২২ কলকাতা সংস্করণের আনন্দবাজার পত্রিকার অষ্টম পৃষ্ঠায় একটি রঙিন ছবি প্রকাশিত হয়। বেশ কৌতুহলোদ্দীপক সেই ছবিতে দেখা যাচ্ছে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী, একদা মোদির হিন্দুত্ব বিগ্রেডের অন্যতম জঙ্গি অংশীদার শিবসেনা নেতা উদ্ধব ঠাকরে, মাস্ক পরিহিত ও করজোড়ে যেন 'ভারতেশ্বর' অতি উদ্ধত ও সর্বদর্শী বলে দাবি করা বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত বা অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর মাঝখানে দন্ডায়মান মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল, সংঘ পরিবারের একনিষ্ঠ প্রচারক ভগৎ সিংহ কোশিয়ারি। তাঁরও মুখ মাস্কে পরিবৃত। আর নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদি স্পষ্টতই রাগান্বিত। অবশ্যই তাঁর মুখে মাস্কও নেই। তিনি কুঞ্চিত ভ্রু এবং তর্জনী তুলে মুখ্যমন্ত্রীকে হয় ধমক দিচ্ছেন কিংবা জোরের সঙ্গে কিছু বোঝাতে চাইছেন।

ভারত রাষ্ট্রের সংবিধান নির্ধারিত যুক্তরাষ্ট্রীয় কিংবা ফেডেরাল ব্যবস্থার সঙ্গে এ ধরনের একটি ছবি কোনোভাবেই খাপ খায় না। নির্দিষ্টভাবে কোনও জনবিরোধী অপকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও দেশের প্রধানমন্ত্রী কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এমন দৃষ্টিকটু আচরণ করতে পারেন না। ২০০২ সালের গুজরাত গণহত্যায় এক অর্থে প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকলেও দেশের শীর্ষ ন্যায়ালয় তাঁকে সসম্মানে সমস্ত অনৈতিক ও হিংস্র কর্মকান্ড থেকে অবলীলায় মুক্ত করে অভিযোগকারী নীতিগত অবস্থানে বলীয়ান মানুষদের গ্রেপ্তার করার মতো রায়দান করে। তিনি তো সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী এবং সবার ওপরে! তিনি অন্য সবাইকে পদদলিত করার অনায়াস অধিকার অর্জন করেছেন। তাঁর অঙ্গুলি হেলনে এক সর্বতোভাবে ফ্যাসিবাদী সংঘশক্তি বিরুদ্ধ মতকে নস্যাৎ করতে, দমন করতে সদা উৎসুক। এমন এক নেতার সর্বব্যাপ্ত ক্ষমতা সমন্বিত দেশের কল্পনা কি দুই দশক আগেও করা গিয়েছিল!

আবার এই মানুষই যখন মার্কিন মুলুকের সর্বোচ্চ কর্তা, একদা এক ভয়ংকর দক্ষিণপন্থী উদ্ধত, দুর্বিনীত এবং সমানুভূতিহীন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সামনে নতজানু, বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা, তাঁকে পুনর্নির্বাচিত করার আবেদন জানিয়ে তিনি সুদূর আমেরিকার হিউস্টন শহরে প্রকাশ্যে বলতে পারেন ''আব কি বার ট্রাম্প সরকার''। সমবেত প্রবাসী ভারতীয়রা সহর্ষ উল্লাস করেন। আবার মার্কিন দেশের অতি সন্ত্রস্ত নাগরিকরা যখন সমবেত উদ্যোগে ট্রাম্পকে পরাজিত করে ডেমোক্রাটিক পার্টির নেতা জো বাইডেনকে নির্বাচিত করে তখনই নরেন্দ্র মোদি সম্পূর্ণ ভোল পাল্টে বাইডেন-এর চরণাগত। এই চরম মেগালোম্যানিয়াক প্রচারকটি নিঃসন্দেহে শক্তের ভক্ত, নরমের যম। মার্কিন রাষ্ট্রীয় প্রশাসন বিশেষ করে, ওই দেশের সমরসম্ভার এবং গুপ্তচর বাহিনীকে বিশেষভাবে একান্ত অনুগত দাসানুদাসের মতো সেলাম ঠোকেন।

আবার দেশে ফিরে এলেই শিবাকীর্তন করা মানুষটি চলায় ফেরায়, আচারে আচরণে এবং মিথ্যাভাষণে ছাপ্পান্ন ইঞ্চির চূড়ান্ত দাপট প্রদর্শন করেন। উল্লিখিত ছবিটি তারই এক সামান্য নমুনা মাত্র। ঘটনা পরম্পরা লক্ষ্য করলে সহজেই অনুধাবন করা সম্ভব যে, ১৫ জুন মহারাষ্ট্রের মহাবিকাশ আগারির নেতা ও মুখ্যমন্ত্রীকে রক্তচক্ষু দেখিয়ে সম্ভবত তাঁকে উগ্রহিন্দুত্ববাদী মতাদর্শ, যার অন্যতম স্থপয়িতা উদ্ধব ঠাকরের পিতা স্বয়ং বাল ঠাকরে তাঁর কথা মনে করিয়েই নির্দেশ দিচ্ছিলেন 'ঘর ওয়াপসির'। অর্থাৎ, ঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক মহাজোট পরিত্যাগ করে মানবিক বোধশূন্য হিন্দুত্ববাদী অপশক্তির সঙ্গে সামিল না হলে কী হতে পারে তাই সম্ভবত বোঝাচ্ছিলেন। ছবি তো একেবারে ভুল বলে না।

উদ্ধব ঠাকরে মহাপ্রভুর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন নি। তিনি অতীতের শিবসেনা দলের উগ্র সংখ্যাল্প মানুষদের ভীত সন্ত্রস্ত করা, হত্যা ও লুণ্ঠন করার অপমানবিক পথ পরিত্যাগ করে গণতান্ত্রিক বোধে সঞ্জীবিত হয়েছেন। তিনি এই উন্নত মনোভঙ্গি পরিত্যাগ করে আবার একই গোয়ালে জাবনা কাটতে সম্মত হন নি। ছবিতে যেমন দেখা যাচ্ছে, তিনি হয়তো করজোড়ে নরেন্দ্র মোদীকে সে কথাই বোঝাতে চাইছেন। আর ক্রুর পন্থায় ভীত সন্ত্রস্ত করে কার্যসিদ্ধির পথে চলতে নিদারুণভাবে অভ্যস্ত স্বৈরশাসক ভাল কথায় ভুলবেন কেন? তাঁর প্রবৃত্তিই তো সংঘপরিবারের মন্ত্রে দীক্ষিত। সেই প্রবৃত্তিই তাঁকে অবিরত প্রলুব্ধ করে হিংসার পথে, অসহিষ্ণুতার পথে এবং দুর্বার রাজনৈতিক শক্তি সংহত করে আরও ভয় দেখাতে। এমন এক প্রধানমন্ত্রী যে, বেশ কিছুকাল যাবৎ দেশের সামুহিক সর্বনাশ ঘটিয়েই যাবেন তাতে বিস্ময়ের কোনও কারণ নেই।

১৫ জুনের দাম্ভিক এবং ভীতি উৎপাদনকারী নির্দেশ মানতে অমান্য করেছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী। সাতদিন সময়ও নেননি মোদীর দল। বহু কোটি টাকা ব্যয় করে প্রায় তিরিশজন বিধায়ক 'বাগী' হয়েছেন। তাঁরা আপন রাজ্যে অবস্থান করতে হয়তো শঙ্কিত বোধ করেছেন ফলে, বহু কোটি টাকার বিনিময়ে সেই গুজারাতের সুরাট শহরে কিয়ৎকাল আশ্রয় নিয়েছিলেন। ২১ জুন এমন এক বিপ্রতীপ ঘটনা ঘটিয়ে রাজ্যে সরকার বদল বা 'রেজিম চেঞ্জ' যে শাহ-মোদীর অতি পছন্দের ছক সে প্রসঙ্গে কোনও সন্দেহ নেই।

অল্প কিছুদিন সুরাট শহরের দামী হোটেলে অবস্থান করে সমস্ত বাগীদের নিয়ে উড়ে গেলেন বিজেপির প্রথম পছন্দের শিবসেনা নেতা জনৈক একনাথ সিন্ধের নেতৃত্বে। মুম্বাই এর কাছে থানে শহরের তিনি নাকি অতি উগ্র হিন্দুত্ববাদী একাধিপত্য স্থাপনে সবিশেষ উদ্যোগী। সুতরাং মোদী-শাহ'র পছন্দ তো হবেই। বহু কোটি টাকা ব্যয় করে এইসব ঘোড়া কেনাবেচা করার মতো বিধায়করা উড়ে গেলেন দেশের একেবারে পশ্চিমপ্রান্ত থেকে পূর্ব প্রান্তের রাজ্য অসমের গৌহাটিতে। এত ব্যয় বহুল বিমান যাত্রার অর্থ নিশ্চিতই কালো টাকার অঢেল আয়োজন। ঠারে ঠারে শোনা যাচ্ছে যে, দেশের সম্পত্তিবানদের মধ্যে প্রায় সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে যাওয়া গৌতম আদানি এসবের অর্থ ও পরিকাঠামোর সুচারু ব্যবস্থাপনায়। কর্পোরেট সহায়তা ছাড়া মোদীরা চলতেই পারেন না। আবার নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক কর্পোরেটকে বিশেষ প্রশ্রয় দিয়ে বা রাষ্ট্রীয় সহায়তা প্রদান করে উন্নতির শীর্ষদেশে স্থাপন করতেও মোদী উদ্যত।

এর পর ৪-এর পাতায়

লঙ্কাকাণ্ড চলছে

শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট গোটাবায় রাজাপক্ষের পদত্যাগের দাবিতে যে আন্দোলনকারীরা মাসাধিককাল আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে, তাদেরই সমর্থন জানালেন নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমসিঙ্ঘে। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক দুরাবস্থার জন্য প্রেসিডেন্ট গোটাবায়া রাজাপক্ষকেই দায়ী করলেন নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমসিঙ্ঘে যাঁকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেছেন এখনও ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট গোটাবায়া রাজাপক্ষই। নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী 'Gota Go Home' এর পক্ষে আন্দোলনকারীদের স্বার্থ দেখভাল করার জন্য একটি কমিটিও ইতিমধ্যে গঠন করেছেন। নতুন প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস, প্রতিবাদীদের স্বার্থ সংরক্ষিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস গ্রহণ করা হবে, যা দেশের আর্থিক পুনর্গঠনে সাহায্য করবে। বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমসিঙ্ঘে বলেছেন, 'Gota Go Home' আন্দোলন, দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তন আনার জন্য চলবে এবং দেশের যুবসম্প্রদায়কেই রাজনৈতিক নেতৃত্বদানের জন্য এগিয়ে আসতে হবে।

ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টির (UNP) নেতা ৭৩ বছর বয়স্ক রনিল বিক্রমসিঙ্ঘেকে শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপক্ষের পদত্যাগের পর প্রায় এক সপ্তাহ দেশে প্রধানমন্ত্রীর স্থানটি শূন্য থাকার পর রনিল বিক্রমসিঙ্ঘেকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করা হয়েছে এবং এই নিয়ে পাঁচবার প্রধানমন্ত্রী হলেন রনিল।

প্রসঙ্গত, মাত্র এক মাস আগে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের কাছে নতুন প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী পদ গ্রহণে তাঁর আপত্তি আছে। ..... তাঁর দল United National Party। তিনিই পার্লামেন্টে একমাত্র নির্বাচিত সদস্য এবং এক সদস্য এই দলের হয়ে তার পক্ষে দেশের জন্য কার্যকর কিছু করা অসম্ভব। কিন্তু গত ১২ মে প্রধানমন্ত্রীর পদে শপথ নেওয়ার পর প্রমাণিত হল রাজনীতিতে এক সপ্তাহ বেশ দীর্ঘ সময় হলেও 'একমাস'কে এক যুগ বলা যেতে পারে।

জনৈক ব্রিটিশ সাংবাদিকের প্রশ্ন ছিল, একজন মাত্র পার্লামেন্টের সদস্য বিশিষ্ট দলের রনিল বিক্রমসিঙ্ঘে কিভাবে প্রধানমন্ত্রী রূপে দেশ চালানোর ম্যান্ডেট পেতে পারেন। নব নিযুক্ত প্রধানমন্ত্রীর চটজলদি জবাব, ১৯৩৯ সালে ইংল্যান্ডে মাত্র পাঁচ সাংসদ বিশিষ্ট দলের নেতা হিসাবে উইলসন চার্চিল বিশ্ব ইতিহাসের এক দুর্যোগকালীন মুহূর্তে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, দেশের একজন অন্যতম সফল প্রধানমন্ত্রী রূপে সারা বিশ্বের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। কাজেই রাজনীতিতে অসম্ভব বলে কিছু নেই।

গত ৬ বছরে মোদী জমানায় কিছু অসামান্য কাজের খতিয়ান

(১) ভারত ৪৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বেকারির মধ্যে পড়েছে। (তথ্য : NSSO)

(২) পৃথিবীর সবচেয়ে দূষিত ৩০টা শহরের ১২টা শহর ভারতে। (তথ্য : NSSO)

(৩) ভারত ৮০ বছরের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিখরে। (তথ্য : Credit Suisse Report)

(৪) মহিলাদের বসবাসের পক্ষে ভারত এই মুহূর্তে পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক দেশ। (Thomas Reuters Survey)

(৫) ২০০০ সালের পর সর্ব নিম্ন GDP।

(৬) দশ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কাশ্মীরি তরুণ টেররিস্ট হয়েছে এবার।

(৭) ভারতের ব্যাঙ্কগুলি ৬৬০০০০ কোটি টাকা ব্যাড লোন বা এন পি এ-র চাপে বিপর্যস্ত মোদী জমানায়।

(৮) ২৩ শতাংশ দারিদ্র্য বেড়েছে।

(৯) ভারতের কৃষকরা ১৮ বছরের ভেতর সবচেয়ে কম শস্যের মূল্য পেল। (WPI Data)

(১০) সম্পদের বিচারে ভারত পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বৈষম্যমূলক দেশ। (Global Wealth Report)

(১১) ভারতীয় মুদ্রার মূল্য এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে নীচে। (Market Data)।

(১২) পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে ভারত পৃথিবীর তৃতীয় খারাপ দেশ। (EPI 2018)

(১৩) ৬ বছরে আমাদের প্রধানমন্ত্রী একটাও সাংবাদিক সম্মেলন করেন নি। ৭০ বছরে এমন ঘটনা ঘটেনি।

(১৪) সুপ্রিম কোর্টের চার বিচারক সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান "Democracy is in Danger"। ভারতের ইতিহাসে প্রথম।

(১৫) ধর্মীয় উত্তেজনা ও হিংসা ৭০ বছরের মধ্যে শীর্ষে।

(১৬) গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স বা অনাহারের সূচক ভারত ১১৭ দেশের মধ্যে ১০২ নম্বর স্থানে রয়েছে। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল ভারতের ওপরে আছে। (Global Hunger Report, 2019)

(১৭) ২০১৯ এর মার্চে ইউনাইটেড নেশনস ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস ইনডেক্স প্রকাশ করে। ৬টি সূচকের ভিত্তিতে সামুহিক সুখের বিচার করা হয়েছে : মাথাপিছু জিডিপি, সুস্থ জীবন ও গড় আয়ু, জীবনে নিজের পছন্দ বাছার স্বাধীনতা, সমাজের পাশে থাকা বা নিঃস্বার্থ সাহায্য পাওয়া ও করা, উদারতা ও দুর্নীতি বিষয়ে ধারণা। এই সব ধরে ১৫৩ দেশের মধ্যে মোদীর ভারত ১৪০ নম্বরে। ২০১৩ সালে ছিল ১১৭ নম্বরে, পাকিস্তান ৬৭ নম্বরে, আর আমাদের জীবন থেকে চাকরি, স্বাধীনতা, আনন্দ সব নিয়ে গেছে সরকার।

ধর্মের জিগির তুলে ক্ষুধার্ত মানুষকে অনন্তকাল ভুলিয়ে রাখা চলবে না

খুচরো বাজারে মূল্য বৃদ্ধির চড়া হার ৮ বছরের রেকর্ড ভেঙেছে। পাইকারি বাজারও পাল্লা দিয়ে ২৪ বছরের রেকর্ড ভেঙে ফেলল। প্রশাসন নীরব, জ্ঞানব্যাপী, মসজিদ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় কি হয়, মথুরার ইদগা মসজিদ নিয়ে বিতর্ক কোন দিকে মোড় নেয় এসব অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ (!) বিষয়ের দিকে এদের নজর। এঁরা সফল সাম্প্রদায়িক অশান্তি তৈরি করে মানুষের নিত্য দিনের সমস্যা থেকে নজর ঘোরাতে। মূল্যবৃদ্ধি তিন দশকের রেকর্ড ভেঙে ফেললেও বিতর্ক তৈরি করা হয়েছে। কুতুবমিনার, লাউড স্পীকার, তাজমহল নিয়ে, অর্থমন্ত্রীর মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের আশ্বাস সত্ত্বেও, শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজেনি।

বর্তমানে ভারত তীব্র এক সামাজিক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলছে। সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির রাশ টেনে না ধরলে, বিভাজনের রাজনীতিকে এমন ভাবে উস্কে দিলে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বেই। যেভাবে দেশজুড়ে সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক হিংসার খবর দেশে বিদেশের সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত পশ্চিমী সংবাদমাধ্যমও ভারত সম্পর্কে উৎসাহ হারাচ্ছে, বিদেশি পুঁজি ও বিনিয়োগের জন্য নিরাপদ জায়গা খোঁজে। পরিস্থিতি প্রতিকূল হলেই লগ্নি গুটিয়ে নেওয়ার পালা শুরু হয়। যে সব শক্তিগুলির জন্য এই সংকট, যেভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নীতির জন্য ফ্রাঙ্কেনস্টাইন তৈরি হচ্ছে তার ফল দেশবাসীকেই ভুগতে হবে।

জীবিকা হারিয়ে স্বেচ্ছামৃত্যুর অনুমতি চাইছেন গুজরাটের ছ'শো মৎস্যজীবী

গুজরাটের ছ'শো মৎস্যজীবী স্বেচ্ছামৃত্যুর অনুমতি চেয়েছে গুজরাট হাইকোর্টের কাছে। বেদনাদায়ক সংবাদ। এই মৎস্যজীবীরা মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার অপরাধে তাদের উপর প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞার জন্য তাঁরা জীবিকা হারাচ্ছেন। নিষ্কৃতি-মৃত্যুর অনুমোদন চেয়েছে রাষ্ট্রের কাছে। কঠিন রোগে আক্রান্তরা নিষ্কৃতি মৃত্যু চাইলেও জীবিকা হারানো মানুষদের মৃত্যুর আবেদনের কথা জানা নেই। এই মুসলমান মৎস্যজীবীরা বংশপরম্পরায় গুজরাটের নদী ও জলাভূমিতে মাছ ধরে আসছে। স্থানীয় প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞার ফলে নদী ও জলাভূমিতে মাছ ধরা নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য সমুদ্রে মাছ ধরাই এখন তাঁদের সামনে একমাত্র পথ। সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য ট্রলার ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য বিপুল পুঁজির প্রয়োজন। মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত বলেই ব্যাঙ্কও ঋণ দেয় না। চড়া সুদে টাকা ধার নিয়ে কেনা বড় নৌকা এবং জাল পোরবন্দর এলাকায় রাখতে দেয় না স্থানীয় খারুয়া সম্প্রদায়ের হিন্দুরা। পোরবন্দর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে নভি বন্দরে (সরকারি বন্দর) খারুয়া মৎস্যজীবীরা নানা সমস্যা সৃষ্টি করে। মুসলমান মৎস্যজীবীদের বন্দর এলাকায় মাছ বিক্রির জন্য বসতে দেওয়া হয় না। স্থানীয় প্রশাসনও নীরব। রাজনৈতিক নেতারাও জাত পাত নির্ভর হিন্দু ভোট ব্যাঙ্ক হাতছাড়া করতে চায় না।

মুসলমান মৎস্যজীবীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। তাদের আত্মহত্যার অনুমোদন চাওয়ার মধ্য দিয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছেন এই দুর্ভাগা মানুষগুলি।

অযোধ্যা সূচনা মাত্র, কাশী মথুরা বাকী আছে

হিংস্র হিন্দুত্ববাদীদের এই স্লোগানের যাথার্থ্য এখন দেশে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তাই উত্তরপ্রদেশের বিজেপি নেতা রজনীশ সিং-এর দাবি। তাজমহলে বন্ধ ২২টি ঘর খুললেই সব জানা যাবে, বেরিয়ে আসবে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি আর তাতেই বোঝা যাবে তেজো মহালয় (তাজমহল) আদতে ছিল শিবমন্দির। এলাহাবাদ হাইকোর্ট আপাতত এই দাবি খারিজ করলেও তাতে আসন্ন এক ভয়ঙ্কর বিপদের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

যে সব শক্তি এতদিন সমাজের প্রান্তিক শক্তি হিসাবে পরিগণিত হত, তারাই এখন সংখ্যাগুরুবাদের রাজনীতির দৌলতে দলবদ্ধ হয়ে ত্রাস সৃষ্টি করছে— বিপদ এখানেই।

আচমকা গম রপ্তানি পুরোপুরি বন্ধের হুকুমনামা

আগামি ডিসেম্বরে গুজরাতে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন। আচমকা পুরোপুরি গম রপ্তানি বন্ধের কেন্দ্রীয় সরকারি নির্দেশের সঙ্গে ইউক্রেন যুদ্ধের সম্পর্ক কী? সম্পর্ক একটা আছে বৈকি। সরকার অবশ্য বলছে গম রপ্তানি চলতে থাকলে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা বিপর্যস্ত হতে পারে। কারণ, বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গম উৎপাদনকারী দেশ ইউক্রেনে যে ডামাডোল চলছে তাতে আন্তর্জাতিক বাজারে গমের বর্ধিত চাহিদা সামাল দিতে ভারত বেশ অসুবিধায় পড়তে পারে যার নেতিবাচক প্রভাব দেশের খাদ্য নিরাপত্তার উপর পড়বে। গম রপ্তানি বন্ধের সিদ্ধান্ত আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

আসল কারণটা অবশ্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নয়। গুজরাত নির্বাচনে বিজেপি বেশ অসুবিধায় পড়তে পারে, সেই সম্ভাবনা মাথায় রেখেই সম্ভবত এই সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের।

প্রসঙ্গত, গুজরাতে বিগত পাঁচ নির্বাচনে উপর্যুপরি বিজেপি জিতেছিল। নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার সম্ভাবনা থাকায় বিজপির কাছে ছ'বার নির্বাচনে জয়ের সম্ভাবনা হয়ত সহজ নাও হতে পারে। তাছাড়া ২০১৭-র নির্বাচনে জয়ের মার্জিনটা তেমন কিছু আহামরি ছিল না। গুজরাত বিধানসভার মোট ১৮২টি আসনের মধ্যে বিজেপি জিতেছিল ৯৯টি আসনে। পরে অবশ্য ভোটের পরে নানা কলাকৌশলে আরও ১১টি আসন বিজেপি'র পকেটে এসেছিল। এবার তাই মাত্র ৯টি আসন হারানো ছবিটা বদলে যেতে পারে। অতএব ভোটের আগে রাজ্য রাজনীতির দাবা খেলায় বিজেপিকে সতর্ক হয়েই দান ফেলতে হবে। অতএব গম রপ্তানি বন্ধের সিদ্ধান্ত এমন এক জনকল্যাণমুখী সিদ্ধান্ত যা বিজেপিকে কিছুটা স্বস্তি দিতে পারে।

তাছাড়া রাশিয়া এবং ইউক্রেন আন্তর্জাতিক গমের ব্যবসার ২৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করছিল। আন্তর্জাতিক বাজার দর ছিল ১৬০ ডলার/প্রতি টন (২০১৮), ভারতের চেয়ে অনেকটা কম, গমের বাজারে ভারত এতাবৎকাল সুবিধা করতে পারেনি। যুদ্ধের পরিস্থিতিতে গমের বাজার দ্রুত উর্দ্ধমুখী হওয়ায় রপ্তান্তির বাজারে ভারত বেশ সুবিধাজনক অবস্থায় থাকায় ২০২১-২২ অর্থবর্ষে ভারত ৭ মিলিয়ন টন গম রপ্তানি করতে পেরেছে। এখন বাজার দর প্রতি টন ৪৫০ ডলার চলছে। ১৫-২০ মিলিয়ন টন গম রপ্তানির সম্ভাবনা ছিল। যার মোট মূল্য হতে পারে ১০ বিলিয়ন ডলার। সমস্যা হচ্ছে মাত্রাহীন ভাবে গম রপ্তানি চলতে থাকলে অভ্যন্তরীণ বাজারে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় বিজেপিকে আচমকা গম রপ্তানি বন্ধের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। ভারতের গম উৎপাদনকারী চাষীরা বাড়তি লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় স্বভাবতই ক্ষুব্ধ। আন্তর্জাতিক বাজারে গম রপ্তানি সম্পর্কে অনেক লম্বা চওড়া আশ্বাস দেওয়ার পর এভাবে হঠাৎ পিছিয়ে আসায়, সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক নেতৃত্বও ভারতের উপর বেশ ক্ষুব্ধ।

তিস্তার গ্রেপ্তার এবং আজকের ভারত

গৌতম রায়

সাম্প্রদায়িকতার পথ ধরে ফ্যাসিবাদ ভারতের দীর্ঘদিন ধরেই তার নখদন্ত বিস্তার করবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সেই চেষ্টা যে এখন একটা উচ্চপর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে তা তিস্তা শীতলবাদ থেকে মহম্মদ জুবাইয়ের কে গ্রেপ্তারের ঘটনাবলীর ভেতর দিয়ে আমাদের কাছে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। ভারতে ক্ষমতাসীন আর এস এসের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপি কোনো অবস্থাতেই সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে দাঁড়ানো কোনো রাজনৈতিক দল সংগঠন বা ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে তাঁর নিজের মত প্রকাশ করতে দেবে না। সংখ্যালঘুর পক্ষে একটি শব্দও উচ্চারণ করতে দেবে না। সংখ্যালঘুর জানমালের নিরাপত্তার দাবিতে কোন ধরনের কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হতে দেবে না।

আর এস এসের ঘোষিত কর্মসূচি হলো মুসলমান মুক্ত ভারত। ফ্যাসিবাদী সংগঠন আর এস এসের এই ঘোষিত কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করাই হলো তাদের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপি'র সবথেকে বড় কর্মসূচি। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য রাষ্ট্রশক্তি করায়ত্ত করবার পর থেকে বিজেপি এবং তার বিভিন্ন ধরনের সহযোগী সংগঠনগুলো, তারা কখনো আর এস এসের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, কখনো বা বিজেপির সঙ্গে জড়িত, কখনো বা বিজেপির সহযোগী রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে নিজেদেরকে বিকশিত করেছে, সেই সমস্ত শক্তিগুলি সম্মিলিতভাবে কাজ করে চলেছে।

রাষ্ট্রশক্তির কাছে তিস্তা শীতলবাদের অপরাধ হল, তিনি সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজের উপর রাষ্ট্রশক্তির সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণের স্বরূপ, কেবলমাত্র জাতীয় স্তরে উন্মোচিত করছেন না। আন্তর্জাতিক স্তরেও ভারতের রাষ্ট্রশক্তি কিভাবে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি চরম নেতিবাচক আচরণ করে চলেছে, তথ্য প্রমাণ সহ তার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করছেন। আন্তর্জাতিক দুনিয়ার কাছে হিন্দু সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শক্তি তার বিভিন্ন ধরনের শাখা সংগঠন এবং রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপির চরম ফ্যাসিবাদী আচরণ তুলে ধরবার দায়ে আজ ভারতের যেকোনো ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল সংগঠন বা ব্যক্তি, রাষ্ট্রশক্তির আক্রমণের শিকার।

আর এস এসের তাত্ত্বিক ভিত্তি অন্যতম প্রধান নির্মাতা এম এস গোলওয়ালকার তাঁর 'সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ' তত্ত্বের ভিত্তি নির্মাণ করেছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের নাগরিকত্ব না থাকা বা থাকলেও তাঁদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করার কথা বলে। আর এস এস-এর রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপি ২০১৪ সালে একক গরিষ্ঠতার জেরে ভারতের রাষ্ট্রশক্তি দখল করার পর থেকে ধীরে ধীরে এই দেশের সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়কে তারা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করেছে। তাদের লক্ষ্য মুসলমান সমাজকে নাগরিকত্ব আইন ইত্যাদি করে তাঁদের রাজনৈতিক হিন্দুদের অধীনস্থ করে রাখা।

গোটা হিন্দু সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শিবিরের ঘোষিত রাজনৈতিক অবস্থান হল, সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের সমস্ত ধরনের মানবিক অধিকার হরণ করা। তারা মুসলমান সম্প্রদায়ের সামাজিক অধিকার হরণ করতে সব ধরনের আর্থ-সামাজিক- প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত করছে। একইভাবে তারা মুসলমান সমাজের সংস্কৃতিক অধিকার হরণ করার জন্য সমস্ত ধরনের কার্যক্রম চালাচ্ছে। মুসলমানদের অর্থনৈতিক অধিকার তারা ইতিমধ্যেই হরণ করেছে। কারণ, গোটা দেশের সরকারি-বেসরকারি সমস্ত ধরনের চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে মুসলমান সম্প্রদায়ের নিয়োগের ক্ষেত্রে একটা অলিখিত নিষেধাজ্ঞা ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে জারি হয়েছে।

সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজের ধর্মীয় অধিকার হরণ করার ক্ষেত্রেও আর এস এস বা তার সহযোগী সংগঠনগুলো প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের আওতাভুক্ত বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে দিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের সহযোগী সংগঠনগুলো এই চেষ্টা থেকে বিরত নেই। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আসন্ন ঈদজ্জোহার আগে-পরে পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পরীক্ষা ফেলা হয়েছে, তাতে মুসলমান সমাজের ধর্মীয় অধিকার হরণের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের থেকে কোনো অংশে পিছিয়ে নেই, তা আমরা খুব পরিষ্কার ভাবে দেখতে পাচ্ছি।

ভারতে ধর্মান্ধ ফ্যাসিবাদী শক্তির এই ভয়ঙ্কর পদচারনার ভেতরে দেশের আইনী পরিকাঠামো সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজের অধিকার ঘিরে অত্যন্ত বৈষম্যমূলক আচরণ করে চলেছে। আদালতের কাছে দেশের সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায় যথার্থ বিচার পাচ্ছে না। রাষ্ট্রযন্ত্রের নিপীড়নের শিকার হওয়া সত্ত্বেও আদালত নিগৃহীত মানুষদের পক্ষ অবলম্বন করছেন না। নিগ্রহকারীদের পক্ষ অবলম্বন করছেন। নিগ্রহকারীদের অভিযোগ মুক্তির রাস্তায় হাঁটিয়ে গোটা সংখ্যালঘু সমাজের কাছে দেশের আইনি প্রক্রিয়ার সম্পর্কেও একটা ভয়ংকর হতাশাজনক মানসিকতা তৈরি করা হচ্ছে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, গুজরাট গণহত্যা থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক ভারতে সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িক শক্তি, মৌলবাদী শক্তি, সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর যে ভয়াবহ অত্যাচার করে চলেছে সে সম্পর্কে বামপন্থীদের সঙ্গেই কিছু ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ যেমন, তিস্তা শীতলবাদ, হর্ষ মান্দার, মহম্মদ জুবেইয়ের প্রমুখ প্রতিবাদীরাই শুধু মুখর নন, প্রতিরোধের সংকল্পে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করবার চেষ্টাও তাঁরা করে চলেছেন।

এই রকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে আর এস এসের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপি নির্বাচন প্রক্রিয়াকে তুড়ি মেরে আইনসভার পিছনের দরজা দিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষমতা দখলের এক বীভৎস ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। তিস্তা ও তাঁর সহযোগীদের গ্রেপ্তারের সময়কালেই প্রায় সমান্তরালভাবে মহারাষ্ট্রে ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে হিন্দু সাম্প্রদায়িকদের দুটি শিবিরের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলেছে।

সেখানে শিবসেনার একদা সুপ্রিমো বাল ঠাকরের পুত্র উদ্ধব ঠাকরের নেতৃত্বাধীন শিবসেনা, কংগ্রেস, এন সি পি জোট বা মহাবিকাশ আগারির সরকার মুখে এক ধরনের ধর্মনিরপেক্ষ আচরণের কথা বললেও, সেই সরকারের সঙ্গে নীতি নিয়ন্ত্রক হিসেবে এমন মানুষজনেরা রয়েছেন, যারা ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বা পরবর্তীকালে মুম্বাই দাঙ্গার সঙ্গেও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। সেই সব মানুষদের বিরুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ কমিশন ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করলেও কোনো সরকারই সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের নেতৃত্ব দেওয়া বিজেপি'র একমাত্র আদর্শগত রাজনৈতিক বন্ধু শিবসেনার কোনো কর্মী সমর্থক নেতার প্রতি আজ পর্যন্ত কোনো রকম আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

দুর্ভাগ্যের বিষয় হল এই যে, অতীতে মহারাষ্ট্রে ক্ষমতাসীন বিজেপি শিবসেনা সরকার ঠিক যেভাবে সেই রাজ্যের বিভিন্ন সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রগুলিতে বামপন্থীদের ট্রেড ইউনিয়নকে ধ্বংস করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল, একইভাবে কিন্তু উদ্ধব ঠাকরে নেতৃত্বাধীন শিবসেনা-কংগ্রেসের সরকার ও মহারাষ্ট্রের সংগঠিত ও অসংগঠিত সমস্ত ধরনের ক্ষেত্রগুলিতে বামপন্থীদের ট্রেড ইউনিয়নকে ধ্বংস করবার কাজকেই, সবথেকে বড় কাজ হিসেবে গ্রহণ করেছে।

পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘিরে উত্তরপ্রদেশে যে ধরনের ঘৃণার রাজনীতি আর এস এস বিজেপি পরিচালনা করে, ঠিক সেইভাবেই কিন্তু মহারাষ্ট্রের পরিযায়ী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ঘৃণার রাজনীতি পরিচালনা করে। আজ পর্যন্ত কংগ্রেসের সঙ্গে একসাথে সরকার পরিচালনাকারী শিবসেনা, এনআরসিসি একবারের জন্যও যে ধরনের সামাজিক পরিবেশ, হিন্দু সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শিবির আর এস এস বা রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপি বা তাদের বিভিন্ন ধরনের সঙ্গী-সাথীরা তৈরি করছে, সেই পরিবেশকেই যে মহারাষ্ট্রের বুকে প্রসারিত করার ক্ষেত্রে উদ্ধব ঠাকরে নেতৃত্বাধীন সরকার কোনো অংশে বিজেপি মানসিকতা থেকে ব্যতিক্রমী মানসিকতার পরিচয় দেয়নি, সেকথা বলে নি।

প্রচলিত শব্দগুলিকে তারা এমনভাবে একটা গালিগালাজের পর্যায়ে নিয়ে এসে মুসলমান সম্প্রদায় বা ভিন রাজ্যের মানুষদের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছে তা সাম্প্রদায়িকতা এবং জাতিদাঙ্গাকে উস্কানি দেবে। কংগ্রেস-এন সি পি, উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে সরকারের শরিক থাকাকালীন কিন্তু এই সমস্ত ঘটনাবলি প্রতিবাদ করেনি। প্রতিরোধ তো দূরের কথা।

এইরকম একটি পরিস্থিতির ভেতরে গোটা ভারতের রাজনৈতিক পরিবেশ পরিচালিত হচ্ছে। ভারতের এই রাজনৈতিক পরিবেশটি পরিচালনার ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের জানমালের নিরাপত্তার জন্য যাঁরাই যখন সোচ্চার হয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধেই রাষ্ট্রশক্তিকে সমস্ত রকমভাবে ব্যবহার করেছে হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি। তিস্তা শীতলবাদকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ভারতের একমাত্র বামপন্থীরাই সোচ্চার হয়েছেন। তিস্তা এবং জুবেইয়ের গ্রেপ্তার হওয়ার বেশ কয়েকদিন কেটে যাওয়ার পর, তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা মামুলি প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছেন। কিন্তু তিস্তাদের উপরে এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে প্রতিহত করার ক্ষেত্রে কোনো রাজনৈতিক উদ্যোগ, সামাজিক ব্যবস্থার প্রচেষ্টা আজ পর্যন্ত মমতা বা তাঁর সহযোগী কোনো নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি একটা বিবৃতি দিয়ে পর্যন্ত নিজেদের কর্তব্য পালন করেননি।

তিস্তার গ্রেপ্তারের ঘটনা আন্তর্জাতিক দুনিয়াতে ভারতের হিন্দু সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে অত্যন্ত নেতিবাচক একটা মানসিকতার জন্ম দিয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্থা, কমিটি ইত্যাদির পক্ষ থেকে তিস্তার গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় আন্তর্জাতিক স্তরে তিস্তার অন্যায় গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে যে ধরনের সামাজিক আলোড়ন পড়েছে, তাকে ন্যূনতম মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা পর্যন্ত ভারতের রাষ্ট্রযন্ত্র আজ অবধি করেনি।

দার্জিলিং ও আলিপুরদুয়ার জেলায় নিখিলবঙ্গ মহিলা সংঘের কর্মীসভা

গত ১১ জুন দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়িতে নিখিলবঙ্গ মহিলা সংঘের একটি জেলাভিত্তিক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মহিলা এই সভায় উপস্থিত হন। উক্ত সভার শুরুতে শহিদা খাতুনকে সভাপতি করে সভার কাজ শুরু হয়। এরপর জেলা সম্পাদক কম. ছন্দা গোস্বামী জেলার রিপোর্ট পেশ করেন। সেখানে জেলার মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যা এবং সে সম্পর্কে আগামী দিনে আন্দোলনের রূপরেখা তুলে ধরেন। এরপর নিখিল বঙ্গ মহিলা সংঘের সভানেত্রী কম. সুচেতা বিশ্বাস মহিলাদের দুরবস্থার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েরা ঘরে বাইরে নিগৃহীত হন। করোনা পরবর্তী সময়ে সেই নির্যাতন আরও বেড়েছে। একদিকে যেমন সে কাজ হারিয়েছে অন্যদিকে সেই কাজ না থাকার ফলে তার উপর আক্রমণও আরও বেড়েছে। রাজ্য এবং কেন্দ্র উভয় সরকারই এ বিষয়ে উদাসীন। মহিলা সংঘের নেতৃত্বে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর বলে তিনি জানান। এরপর সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা কম. সর্বানী ভট্টাচার্য তাঁর আলোচনায় বলেন যে, এক ভয়ংকর অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি। সারা পৃথিবী জুড়ে মহিলারা ভীষণ কঠিন অবস্থায় রয়েছেন। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সহ জ্বালানির দাম বৃদ্ধি যত হচ্ছে ততই মেয়েদের জীবনযাপন কঠিন হয়ে যাচ্ছে। একদিকে যেমন ২০২১ সালে মেয়েরা প্রায় ৪৭ শতাংশ কাজ হারিয়েছে যা পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি। একইসঙ্গে সেই হারানো কাজ আর তারা ফিরে পাননি। ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার তারাই। এর ফলে একদিকে যেমন বাল্যবিবাহ বাড়ছে তেমনি বাড়ছে নারী ও শিশু পাচার। অন্যদিকে সমান কাজে সমান মজুরি মেয়েরা পাচ্ছেন না, ঘরে-বাইরে সর্বত্রই তারা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন।

এই দুর্বিষহ অবস্থার বিরুদ্ধে সংগঠন লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাবে। আর এস পির জেলা সম্পাদক কম. তাপস গোস্বামী তাঁর আলোচনায় বলেন এই পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা তার স্বার্থেই মহিলাদের পণ্য করে তোলে এবং ধর্ম ও সম্প্রদায়ের নামে সমস্ত কিছুকে গুলিয়ে দিয়ে জীবন ও জীবিকার লড়াইকে পিছিয়ে দেয় এর বিরুদ্ধে মহিলা সংগঠনকে তার লড়াই জারি রাখতে হবে। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন আর এস পি'র জেলা কার্যকরী কমিটির সদস্য বিকাশ সেন রায় সহ বিভিন্ন মহিলা নেতৃবৃন্দ। এই কর্মীসভা থেকে ছন্দা গোস্বামীকে আহ্বায়িকা করে ১৫ জনকে নিয়ে একটি প্রস্তুতি কমিটি তৈরি হয় ও আগামী দিনে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত হয়।

গত ১২ জুন কালচিনিতে নিখিলবঙ্গ মহিলা সংঘের আলিপুরদুয়ার জেলার একটি কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রবল ঝড় বৃষ্টির মধ্যেও জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু সংখ্যক মহিলারা কর্মী সভায় অংশগ্রহণ করেন। সমগ্র এলাকা সংগঠনের পতাকা দিয়ে সুসজ্জিত হওয়ার ফলে ব্যাপক মানুষের মধ্যে এই সভা সাড়া ফেলে। সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে কর্মীসভার কাজ শুরু হয়। কম. প্রীতি দত্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভার প্রথমে জেলা সম্পাদিকা কম. মদিনা বেগম জেলার একটি রিপোর্ট পেশ করেন। এরপর সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী কম. সুচেতা বিশ্বাস রাজ্যব্যাপী মহিলাদের উপর আক্রমণ বৃদ্ধি, লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি, জ্বালানি খরচ বৃদ্ধির ফলে মেয়েরা যে এক দুর্বিষহ অবস্থায় পৌঁছেছেন সে বিষয়ে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একইসঙ্গে তিনি এও বলেন যে কেন্দ্র-রাজ্য উভয় সরকারই এই বিষয়গুলির প্রতি একেবারে উদাসীন। এর ফলে এই দুই স্বৈরাচারী

এরপর ৬-এর পাতায়

গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক মূল্যবোধ .....

১-এর পাতার পর

বহুল আলোচিত যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রথমবার অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে গৌতম আদানির জন্য কুইন্সল্যান্ডের কয়লা খনির বরাত প্রার্থনা করেছিলেন। তৎকালীন অতি দক্ষিণপন্থী ওই দেশের প্রধানমন্ত্রী তা মেনে নিয়েই আদানিকে বরাত দিয়েছিলেন। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার পরিবেশকর্মীরা বিশেষ আপত্তি করেন এবং তার ফলে ওইসব খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের কাজ বহুকাল সম্ভব হয় নি। ইদানিং কোনক্রমে শুরু হয়েছে। অবশ্যই নির্দিষ্টভাবে ওই দেশের পরিবেশ বিধি মেনেই। এতকাল বিনিয়োগের অর্থ আটকে থাকলেও আদানির কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয় নি। কারণ, মোদীর নির্দেশে বহু সহস্র কোটি টাকার সংস্থান করেছিল দেশের আপামর মানুষের কষ্টার্জিত অর্থে পুষ্ট ভারতীয় স্টেট ব্যাংক। যা ক্ষতি হবার তা হল সেই ব্যাংকের। আদানির কি এসে যায়! অর্থাৎ, লাভ হলে বেসরকারি কোম্পানির আর ক্ষতি হলে তা, জনগণের। এই অর্থনৈতিক সূত্র অনুসরণ করেই মোদী সরকার চলছে।

মোদী সরকারের কর্পোরেট প্রীতি বা তাদের স্বার্থসিদ্ধির পথে একনিষ্ঠভাবে চলার আকুতি সম্পর্কে নতুন করে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু, যে বিষয়টি উল্লেখ্য তা হল, বিগত কয়েক মাস যাবৎ দেশে জীবাশ্ম জ্বালানি বা কয়লার নাকি বিশেষ অভাব দেখা দিয়েছে। সংবাদ মাধ্যমগুলিতে এমন আশংকাও বারংবার প্রচারিত হচ্ছিল যে, কয়লার অভাবে বহু রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হবে। অন্ধকার নেমে আসবে জনজীবনে। বিস্তীর্ণ অঞ্চল বিদ্যুৎ সরবরাহের অভাবে বিপদগ্রস্ত হবে।

কৌতুককর বিষয় সমসাময়িক কালে অস্ট্রেলিয়ায় আদানির খনি ব্যবসায়ে কয়লা উত্তোলন হচ্ছে। ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, সমস্ত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে অস্ট্রেলিয়া থেকে আমদানি করা কয়লার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কোনও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র যদি নির্দিষ্ট শতাংশ অস্ট্রেলিয়ার কয়লা ব্যবহার না করে তাহলে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। এর সরল অর্থ, আদানির ব্যবসায়িক মুনাফার জন্য দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থাগুলিকে ক্ষতি হলেও সেই পথেই চলতে হবে। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

এমন নির্লজ্জ কর্পোরেট তোষণ ভারতের অন্য কোনও কেন্দ্রীয় সরকার কদাপি করেছে বলে জানা নেই। আবার মোদী সরকারের এহেন কর্পোরেট সেবার প্রতিদানে আদানির কোম্পানি মহারাষ্ট্রে গণতন্ত্র নিধনে প্রভূত অর্থ বিনিয়োগ করতেই পারে। ঘোড়া কেনাবেচায় বিপুল অর্থ ব্যয় করছে এই কর্পোরেট সংস্থাটি। এমনই সংবাদ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। এক বিষচক্র ভারতের সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত করেই চলেছে। গণতান্ত্রিক ধ্বস্ত হয়ে পড়ছে।

মোদী-শাহর সরকার উগ্র হিন্দুত্ববাদের প্রসার ঘটিয়ে, মানুষে মানুষে ধর্ম ও জাতপাতের নামে বিভাজন সৃষ্টি করে প্রকৃত অপকর্মগুলি আড়াল করতে বিশেষ তৎপর। সাধারণ মানুষ যখন জীবন রক্ষা করতেই জেরবার হয়ে চলেছেন সেই সময় মানুষের মনে আরও বেশি করে ভীতির সঞ্চার করে চলেছে মোদী সরকার।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদী কোনকালেই তাঁর অতি সংকীর্ণ সংঘ প্রচারকের পরিচয় ত্যাগ করতে পারেন নি। দেশের বাইরে গেলে তিনি ভারতের উন্নতির গল্প শোনান। সেসব কথা অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধানরা খুব গুরুত্ব দিয়ে শোনেন বা অনুধাবন করেন কিনা তা, সন্দেহের উর্ধে নয়। কিন্তু দেশের মধ্যে তিনি শুধুমাত্র একজন উগ্র সাম্প্রদায়িক হানাহানির উদ্যোক্তাই নয়, তিনি যে, গণতন্ত্রের কোনও ধার ধারেন না, তা বেশ স্পষ্টই উপলব্ধি করা সম্ভব।

গুজরাত গণহত্যা ফিরে দেখা :

স্বনামখ্যাত মানবাধিকার কর্মী ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিহত করতে সদা তৎপর তিস্তা শেতলবাদের স্থান এখন গুজরাত পুলিশের কয়েদখানা। কোনও নির্দিষ্ট গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছাড়াই গুজরাত পুলিশ তিস্তা শেতলবাদকে তাঁর বাসস্থান থেকে তুলে নিয়ে গেছে গুজরাত রাজ্যে। সমস্ত ধরনের অভ্যাবতাই করা হচ্ছে এই মানবাধিকার আন্দোলনের অগ্রণী কর্মী বা নেত্রীর সঙ্গে। তাঁকে এইভাবে পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে এমনকি, রাষ্ট্রসংঘ পর্যন্ত প্রতিবাদে সামিল। কিন্তু, দেশের বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ'র নির্দেশই আপাতত চূড়ান্ত।

একই সময়ে গুজরাতের প্রাক্তন পুলিশ কর্তা আর বি শ্রীকুমারকেও গুজরাত পুলিশ গ্রেপ্তার করে তাদের হেফাজতে নিয়েছে। এই আই পি এস অফিসার ২০০৭ সালে অবসর নিয়েছেন। ২০০২ সালে গুজরাত গণহত্যা সংঘটিত হবার সময় শ্রীকুমার ছিলেন এই রাজ্যের সশস্ত্র পুলিশের প্রধান। তাঁর ভূমিকা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অনুমোদন করেননি। তাঁকে সশস্ত্র পুলিশের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে গোয়েন্দা বাহিনীর কাজে নিযুক্ত করে এবং তাঁকে সক্রিয় ভূমিকা না নিতে প্রকারান্তরে নানাভাবে নির্দেশও দেওয়া হয়। তিনি কিছুটা বেপরোয়া হয়েই নিজের কর্তব্য পালন করে চলেন।

গ্রেপ্তার হবার কিছু সময় আগেই শ্রীকুমার মাতৃভূমি নামে বিখ্যাত মালয়লি সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শীর্ষ আদালতের রায়কে দুর্ভাগ্যজনক বলে অভিহিত করেন। তিনি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, রাষ্ট্রীয় মদতে গণহত্যা সংঘটনের বিরুদ্ধে তিনি অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। এই লড়াই করতে গেলে তাঁর ওপর যে, রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন আরও বৃদ্ধি পাবে সে সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল এবং সচেতন। বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই তিনি উল্লেখ করেন যে, গুজরাত দাঙ্গা সংঘটিত হয় ২০০২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে। তার আগের দিন গোধরা রেলস্টেশনে সবরমতী এক্সপ্রেসের ৬ নং কামরাটি আগুনে ভস্মীভূত হয়। তার পর থেকে ওই রাজ্যের প্রায় সর্বত্র নৃশংস গণহত্যার প্রসার ঘটে। গুজরাতের সরকার সার্বিক দাঙ্গা পরিস্থিতির তদন্ত করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বলেই দিয়েছিলেন যে, গোধরা অগ্নিকাণ্ডে যেভাবে ৫৯ জন অযোধ্যার করসেবককে পুড়িয়ে মারা হয় তার স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া হিসেবেই গুজরাত দাঙ্গা। ফেব্রুয়ারির শেষ দিন থেকে প্রায় এপ্রিল মাস পর্যন্ত সেই হাড় হিম করা হত্যাকান্ডে সহস্রাধিক মানুষের মৃত্যু। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সম্পত্তি লুণ্ঠন এবং অহমেদাবাদের প্রকাশ্য রাজপথে অন্যান্যদের মধ্যে জনৈকা সন্তানসম্ভবা গীতা শ্রীবাস্তবকে পথে ফেলে ত্রিশূল দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা এবং সেই তরুণীর গর্ভে থাকা ভ্রূণটি পর্যন্ত হত্যা করার মতো শিহরিত করা নৃশংসতার প্রকাশ ঘটে। এই তরুণী এক মুসলিম যুবককে বিয়ে করেন। সেটা তাঁর গর্হিত অপরাধ এবং শাস্তি নৃশংস হত্যা।

আহমেদাবাদ, ভদোদারা, সৌরাষ্ট্র, উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ গুজরাত, কচ্ছ অঞ্চল সর্বত্র সশস্ত্র দাঙ্গার আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বেস্ট বেকারী, নরোড়া পাটিয়া, গুলবার্গ সোসাইটি, নরোড়া গাম প্রভৃতি অঞ্চলে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা যেমন খুশি হত্যা ও লুণ্ঠন চালিয়ে যায় দিনের পর দিন। রাজ্য পুলিশ নিষ্ক্রিয় নিশ্চুপ। রাজ্য মন্ত্রীসভা নিশ্চিন্তে দিনাতিপাত করে গেছে। বেশ পরিষ্কারই উপলব্ধি করা গিয়েছিল যে, রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ প্রশ্রয় ও মদতে চলতে থাকে অবাধ নরসংহার। এই প্রসঙ্গে সারা বিশ্বের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকরা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন।

তখন তো কেন্দ্রে অটলবিহারী বাজপেয়ীর এন ডি এ সরকার। সেই সরকারও তো নরেন্দ্র মোদীর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। তৎসত্ত্বেও পার্লিয়ামেন্ট-এর বিতর্কে জেরবার হয়েছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী, আদবানি প্রমুখ। প্রধানমন্ত্রীকে রাজ্যসভার অধিবেশনে কম্পিত কণ্ঠে স্বীকার করতে হয় যে, গুজরাত দাঙ্গা বা নরহত্যা জাতির ইতিহাসে এক গভীর কলঙ্ক লেপন করেছে। তিনি নরেন্দ্র মোদীকে রাজধর্ম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন।

এসব কথায় অবশ্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল, দুর্গাবাহিনী প্রভৃতি হিংস্র সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলির মধ্যে কোনও ভাবান্তরই লক্ষ করা যায়নি। সংঘপরিবারভুক্ত এইসব সংগঠনগুলি হাতে পতাকা নিয়ে নরমেধ যজ্ঞে সামিল হয়েছিল। বহু মহিলা দুষ্কৃতীর হিংস্র আচরণ দেখে দেশের অন্যান্য অংশের মানুষ স্তম্ভিত ও হতবাক হয়ে পড়েছিলেন।

নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন গুজরাত সরকার মুখ্যত গোধরা অগ্নিকাণ্ডের তদন্ত করার জন্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জি টি নানাবতীর নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করে। কিছুকাল পরে আর এক অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি কে জি শাহকে যুক্ত করে নানাবতী-শাহ কমিশন তদন্তমূলক কাজ শুরু করেন। অল্পকালের মধ্যেই নানাবতী-শাহ কমিশন গোধরা স্টেশনের অগ্নিকাণ্ড এবং ৫৯ জনের জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত্যুকে পূর্ব পরিকল্পিত গভীর ষড়যন্ত্রমূলক অপকর্ম বলে অভিহিত করেন। এই কমিশনের সামনে পুলিশ কর্তা আর বি শ্রীকুমার, সঞ্জীব ভাট বা রাহুল শর্মার সাক্ষ্য প্রভৃতি নস্যাৎ করে দেওয়া হয়।

নানাবতী কমিশনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন গুজরাত সরকারের কাছে প্রথম দফায় জমা পড়ে বেশ দ্রুত। সেই রিপোর্টে গোধরা অপকর্মের ঘোর নিন্দা করে একখন্ডে প্রকাশিত হয়। পরের রিপোর্টটি প্রায় ২৫০০ শব্দের এবং নয় খন্ডে বিধৃত। সেই রিপোর্টটি জমা দেবার পর প্রায় পাঁচ বছর তা চেপে রাখা হয়।

নরেন্দ্র মোদী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবার পর ২০১৪ সালে তা প্রকাশিত।

২০১৪ সালে প্রকাশিত রিপোর্টে নানাবতী-শাহ কমিশন মোদী, তাঁর সরকার, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল বা সেই সময়কালের রাজ্য মন্ত্রীসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হরেন পাণ্ড্যকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে ঘোষণা করা হয়। যেমন আশংকা ছিল, সেভাবেই গুজরাতের গণহত্যাকে স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ গুজরাত রাজ্যে যে নৃশংসতার সঙ্গে এতগুলি মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সম্পত্তি নির্বিচারে লুণ্ঠিত হয়েছিল তার জন্য কেউ দায়ী নয়; প্রায় এমন কথাই উল্লেখিত হয়েছে। তৎকালীন পুলিশের অন্যতম শীর্ষ ব্যক্তিত্ব সঞ্জীব ভাট বহুকাল কারাগারে বন্দি। তাঁর অপরাধ তিনি বেশ কিছু সত্য প্রকাশে সোচ্চার হয়েছিলেন। আর এখন অন্যতম আই পি এস অফিসার আর বি শ্রীকুমারকেও গ্রেপ্তার করে অনির্দিষ্টকালের জন্য জেলের ঘানি টানার ব্যবস্থা করা হল। এই ভদ্রলোক প্রখ্যাত নৃত্যশিল্প, সমাজকর্মী ও ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরমাণু বিজ্ঞানী বিক্রম সারাভাই-এর কন্যা মল্লিকা সারাভাই গুজরাত সরকারের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করে মামলা দায়ের করেন। তা, প্রভাবিত করতে মোদী সরকার দশ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে বলে অভিযোগ করেছিলেন। তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতেই এমন অভিযোগ তিনি করেছিলেন। মোদী এবং অমিত শাহ সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। ইদানীং সুপ্রিম কোর্টের রায় এর অন্যায় সুযোগ নিয়ে শ্রীকুমারের ওপর নির্মম আঘাত নামিয়ে আনা হল।

মোদীর কাজকর্মের ধরণ চিরকালই চরম প্রতিহিংসামূলক। ষড়যন্ত্র করার পথেই বিরোধী কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দেবার অপকর্মে তাঁর উৎসাহ সীমাহীন। সাধারণভাবে পৃথিবীর ইতিহাসে স্বৈরশাসকরা এ পথেই চলেন।

তিস্তা শেতলবাদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে আর এস পি'র সাধারণ সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য

বিজেপি'র কেন্দ্রীয় সরকার যে দানবসুলভ আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে গণতান্ত্রিক কণ্ঠরোধের জঘন্য কাজ করেই চলেছে তা বিশিষ্ট সমাজকর্মী তিস্তা শেতলবাদের ওপর গুজরাট পুলিশের নির্মম আক্রমণ ও গ্রেফতারের ঘটনার পুনর্বার প্রমাণিত হলো। ২০০২ সালে নরেন্দ্র মোদির মুখ্যমন্ত্রীত্বকালে সংখ্যালঘু মানুষদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় প্রণোদনায় গণহত্যা সংগঠিত হয়েছিল। সহস্রাধিক নারী শিশু সহ সাধারণ মানুষের হত্যার বিচারবিভাগীয় তদন্ত ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে বিশিষ্ট সমাজকর্মী তিস্তা শেতলবাদ বহুবছর যাবৎ লড়াই করছেন।

দেশের শীর্ষ আদালত তথ্য প্রমাণের অভাবে কোনো মতদান করতেই পারে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কেউ ভিন্ন মত পোষণ করলেই তার বা তাদের ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন নিশ্চিতরূপে ফ্যাসিবাদী আচরণ। কোনও গণতান্ত্রিক বোধসম্পন্ন মানুষের পক্ষে এমন অবস্থা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। আর এস পি'র কেন্দ্রীয় কমিটি গতকাল রাত্রে গুজরাট পুলিশের ফ্যাসিবাদী কায়দায় তিস্তা শেতলবাদকে গ্রেফতার করার তীব্র নিন্দা ও ভর্ৎসনা করে। এমন অসহিষ্ণুতাপূর্ণ ও হিংস্র ভূমিকা যে মোদি-শাহ শাসনের প্রত্যক্ষ মদতেই হয়েছে তা উল্লেখের অপেক্ষা বা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। বস্তুত বিজেপির অপশাসনকালে দেশের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে।

আর এস পি কেন্দ্রীয় কমিটি দেশের সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের কাছে এই ফ্যাসিবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হবার আহ্বান জানাচ্ছে।

সমাজকর্মী তিস্তা শেতলবাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে নিখিল বঙ্গ মহিলা সংঘ

বিশিষ্ট সমাজকর্মী তিস্তা শেতলবাদের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে নিখিল বঙ্গ মহিলা সংঘ রাজ্য কমিটি তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে। গুজরাটে স্বৈরাচারী শক্তি রাষ্ট্রশক্তির মদতে যে পাশবিক আক্রমণ মহিলাদের উপর নামিয়ে এনেছিল তার বিরুদ্ধে লাগাতার প্রতিবাদ জানানোর কারণে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের সুযোগ নিয়ে রাষ্ট্রীয় শক্তি তাঁকে গ্রেপ্তার করে তার উপর যে আক্রমণ নামিয়ে আনল তা প্রকৃতপক্ষেই প্রতিহিংসামূলক আচরণ।

মহিলা সংঘ এই আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং দ্রুত তাঁর মুক্তি ও তাঁর উপর আরোপিত মিথ্যা কেস তুলে নেওয়ার দাবি জানাচ্ছে

সুচেতা বিশ্বাস (সভাপতি)
সর্বানী ভট্টাচার্য (সম্পাদিকা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি)

বাবাসাহেব আম্বেদকর

মনোজ ভট্টাচার্য

বিগত অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তীকাল থেকে প্রায় বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বজুড়ে একের পর এক সামাজিক ও রাজনৈতিক সংঘাতময় পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে। এমন বিস্তীর্ণ সময়কাল জুড়েই মানবসভ্যতা যেমন দুরন্তগতিতে এগিয়েছে তেমনই, মাঝে মধ্যে বিপরীত ঘটনাও ঘটেছে। একদিকে যেমন কার্ল মার্কসের মতো অনন্যসাধারণ দার্শনিক। মানবকল্যাণে সমগ্র জীবন সমর্পণ করে অবদমিত মনুষ্যত্বের মুক্তি পথ নির্মাণ করেছেন তিনি। জ্ঞানে বিজ্ঞানে অফুরন্ত অগ্রগতি। আবার, মুসোলিনী-হিটলারের মতো মানবতার শত্রুদেরও সন্ধান পাওয়া গেছে। মানবেতিহাসে রুশ মহাবিপ্লবের মতো যুগান্তকারী ইতিহাস রচিত হয়েছে আবার প্রায় তারই সমসাময়িককালে ইংরেজ ঔপনিবেশিক চরম অত্যাচারী অপশক্তি পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে গণহত্যা সংগঠিত করেছে। নির্মমভাবে দেশের মুক্তিকামী নারী পুরুষদের হত্যা করেছে। এমন বহু উদাহরণ উল্লেখ করে উপলব্ধি করা সম্ভব যে, উল্লিখিত প্রায় তিন শতাব্দীকাল পৃথিবী নানাবিধ সামাজিক সংঘাতে বিদীর্ণ হয়েছে, টালমাটাল হয়েছে। আবার সমৃদ্ধও হয়েছে।

এমন নিয়ত সংঘাতময় পরিবেশে যেমন নতুন নতুন চিন্তাভাবনা, আবিষ্কারের উদ্ভাস সহজেই লক্ষ করা যায় তেমনই, ঘন তমিস্রার বাতাবরণে বহুসংখ্যক ইতিহাস নির্মাণ করা মানুষের সন্ধানও দুর্লভ নয়। প্রকৃতি পরিবেশে যে দ্বন্দ্বময়তা নিত্যনতুন বোধের সঞ্চার করে, সেভাবেই বহুজনের মানসিক গঠনও বিদ্যুৎ ঝলকের মতোই চতুর্দিক আলোকিত করে তোলে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের প্রসঙ্গ বাদ দিলেও একান্তভাবে আমাদের দেশের ধরিত্রী কি হঠাৎই রত্নপ্রসবা হয়ে উঠেছিল যে, এত সংখ্যক উন্নত মেধার অপার বিকাশ ঘটে গেল? তা নয়। আসলে আপস করে, মেনে নিয়ে, মানিয়ে নিয়ে, কোনক্রমে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টায় কোনো মহৎ-এর সন্ধান পাওয়া যায় না। সামাজিক দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াগুলিই নতুন বিস্ময়কর প্রতিভার জন্ম দেয়। তাঁদের পরিবর্ধিত করে। প্রতিভার স্ফূরণ ঘটায়। বিশ্বজন সেই প্রতিভার আলোকচ্ছটায় বিমোহিত হন। তাঁরা ইতিহাসসিদ্ধ মানুষ হিসেবে আমাদের স্মৃতিতে বিশেষ শ্রদ্ধার আসনে স্থিত হন।

ভারতেতিহাসে অতীব নির্মম ঔপনিবেশিক শক্তির প্রবল আস্ফালনকালেই তো পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত বা তারও কিছুকাল আগে রামমোহন রায়ের অনন্য সামাজিক অবস্থান। বাংলার মাটিতে যদি এমন মানুষদের দুকূলপ্লাবী সামাজিক আন্দোলনের জোয়ার বয়ে যায় তাহলে, ভারতের প্রায় পশ্চিমাংশেও সন্ধান মেলে অতিপশ্চাদপদ জাতিভুক্ত মহামতি জ্যোতিবারাও ফুলে (১৮২৭-১৮৯৩) বা তাঁর স্ত্রী সাবিত্রী বাই ফুলের (১৮৩১-১৮৯৭)। নারীশিক্ষা ও অনড় সামাজিক বদ্ধাবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অনন্য সাধারণ প্রতিভার অনায়াস সন্ধান সম্ভব। সবার ওপরে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দীর্ঘকালীন সৃষ্টি ও কর্মযজ্ঞকে উল্লেখ না করলেই নয়। তাঁর মতো বহুমুখী প্রতিভার সন্ধান তো বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। এই ঘটনাবহুল বা সামাজিক সংঘাতময়তাকে উপেক্ষা করে তো এমন প্রতিভার অনাবিল বিকাশ ব্যাখ্যা করা প্রায় অসম্ভব। মানবেতিহাসে চমৎকার কিংবা হঠাৎ করেই কোনো অলৌকিক ঘটনাবলী ঘটে না। কার্যকারণ এবং পরিবেশ পরিস্থিতি সর্বক্ষেত্রেই অনেকটা বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

ভারতকে আচার সর্বস্ব অন্ধকূপের নিকষকালো গহ্বর থেকে উত্তীর্ণ হবার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন বিশ্বকবি। তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনাই ছিল অন্ধ কুসংস্কারের মরুবালিরাশি থেকে ভারতের সমাজ সংস্কৃতির উত্তরণ। বলতে গেলে সমগ্র দেশের যে অচল অনড় সমাজবোধ সাধারণ মানুষের মননকে আচ্ছন্ন করে বিপুলাকার বিষাদবৃক্ষ মোতায়েন হয়ে ছিল, তা চূর্ণ করতে বিশ্বকবি নির্নিমেষ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে গেছেন। মানবসমাজ ঋদ্ধ হয়েছিল নব নব উপলব্ধিতে, চেতনায়।

এক অমিত প্রতিভার জন্ম :

এমন এক পরিবেশেই কলকাতা শহর থেকে বহুযোজন দূরে একালের মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর শহরের কাছে মৌ ক্যান্টনমেন্টে জন্মেছিলেন এক অফুরন্ত প্রতিভাধর শিশু। ভীমরাও রামজি আম্বেদকর। (১৪ এপ্রিল ১৮৯১—৬ ডিসেম্বর ১৯৫৬)। আম্বেদকরর সর্বজনে পরিচিত হয়েছিলেন 'বাবাসাহেব' হিসেবে। তাঁর জন্ম হয়েছিল এক অস্পৃশ্য, বলা যায়, জল অচল 'মাহার সম্প্রদায়ভুক্ত' এক ব্রিটিশ সেনার পরিবারে। যেমন আমাদের বঙ্গভূমে জন্মেছিলেন সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও সমাজ আন্দোলনের অনন্য প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ড. মেঘনাদ সাহা। তিনিও অস্পৃশ্য, জল অচল এক দরিদ্র পরিবারের সন্তান। সেই অতি পশ্চাদপদ পরিবেশ থেকেই তিনি শত বাধা অতিক্রম করেই বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিকের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। তাঁর ক্ষেত্রেও পদে পদে অস্বীকৃতির লাঞ্ছনা ছিল। অতিক্রম করতে হয়েছে দুস্তর যন্ত্রণাময়তা। তবুও তিনি আজীবন থেমে যাবার ব্যাধিতে ন্যুব্জ হননি। অনেকটা যেন সাদৃশ্য খুঁজে পাই ড. বাবাসাহেব আম্বেদকরের ক্ষেত্রেও।

বালক ভীমরাও বিদ্যালয় শিক্ষাকালেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন নিম্ন বা পশ্চাদপদ জাতিতে জন্মগ্রহণে প্রতিমুহূর্তের বিড়ম্বনা। বিদ্যালয় শ্রেণিকক্ষে তাঁর প্রবেশ অনুমোদিত ছিল না। নিজের পরিবার থেকে চটের থলে নিয়ে ক্লাসরুমের বাইরে বসে বিদ্যালয় পাঠ নিতে হয়েছিল এই বালককে। জল পিপাসা নিবারণের জন্য অন্য কোন উচ্চবর্ণের ছাত্র স্পর্শ বাঁচিয়ে ঘটি থেকে জল ঢেলে দেবে আর তারই সহপাঠী এক অনন্য মেধার কিশোর অঞ্জলি পেতে সেই জল পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করবে! এমনই ছিল সামাজিক বিধান। পানীয় জলের ওপরেও কোনো স্বাভাবিক অধিকার ছিল না বালক ভীমরাও-এর মতো অনেকের। এমন লজ্জাজনক কুপ্রথা এখনও এ দেশের কোনো কোনো প্রান্তে চলে। অতীব লজ্জার প্রসঙ্গ হলেও যে সামাজিক অপরাধ আজ থেকে শতাধিক বছর আগে এক অমলিন মানসিকতার প্রতিভাসম্পন্ন বালকের জীবনচর্যাকে আন্দোলিত করেছিল তা থেকে পূর্ণ মুক্তি অদ্যাবধি সম্ভব হয়নি। মানব সভ্যতার উল্লেখজনক অগ্রগতি ঘটলেও বিজ্ঞান নির্ভর সামাজিক আন্দোলনের অভাবে ভারতের জনসমাজ ঈপ্সিত স্পর্ধায় আজও উন্নীত হতে পারেনি। বিগত কয়েক বছর জুড়ে জাতপাত নির্ভর সামাজিক বিন্যাস সরকারি প্রগলভতায় উৎসাহিত হচ্ছে তা, অপার বেদনার সৃষ্টি করে। যে মনুস্মৃতি নির্ভর সামাজিক বিধানে বালক ভীমরাও প্রতিনিয়ত অপমানিত হয়েও সম্যক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন তা, আজ লজ্জাজনক হলেও সেই মনুসংহিতাই ভারত রাষ্ট্রের অলিখিত সাংবিধানিক অভিজ্ঞান।

সেই অতি প্রতিভাধর বালকটিই অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় রেখে বিদ্যালয় শিক্ষা সম্পন্ন করেন। সমস্ত বাধাকেই তিনি প্রতিস্পর্ধায় মোকাবিলা করেছেন। উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাঁর স্নাতকস্তরের শিক্ষা তৎকালীন বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামী শিক্ষালয় এলফিনস্টোন কলেজে। বড় শহরের ছাত্র ও শিক্ষকদের মানসিক গঠন গ্রামীণ পরিবেশের তুলনায় কিছুটা অন্য। ভীমরাও রামজী আম্বেদকরও বেশ স্বচ্ছন্দে স্নাতকস্তরের পাঠ কৃতিত্ব সহকারে সম্পন্ন করেছিলেন। তিনি অবশ্য অস্পৃশ্য জাতিভুক্ত প্রথম স্নাতক ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের। বিষয় ছিল অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি।

তাঁর অসাধারণ মেধার সন্ধান পেয়েছিলেন বরোদার রাজা সয়াজিরাও গায়কোয়াড়। মুখ্যত তাঁরই অর্থানুকূল্যে আম্বেদকর সুযোগ পেলেন সুবিখ্যাত কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পাঠ সম্পন্ন করার। মাত্র উনিশ বছরের সদ্য যুবক কৃতী ছাত্র পাড়ি জমালেন সুদূর আমেরিকায় উচ্চতর শিক্ষার সন্ধানে। রাজা গায়কোয়ার আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করেছিলেন অতি প্রতিভাধর ছাত্রটিকে ভবিষ্যতে তাঁর রাজকর্মচারী হিসেবে অধিকার করার উদ্দেশ্যে। চুক্তি হয়েছিল যে, শিক্ষা সম্পন্ন করে তিনি বরোদার রাজদরবারে কর্মচারী হিসেবে বৃত হবেন। অফুরন্ত জ্ঞানপিপাসু ভীমরাও আম্বেদকর তাই মেনে নিয়েছিলেন।

মাত্র তিন বছরের মধ্যেই সুবিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি স্নাতকোত্তর পাঠে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন শুধু তাই নয়, তিনি অর্থনীতি শাস্ত্রে গবেষণা করে বিদেশে প্রথম ভারতীয় হিসেবে ডক্টরেট উপাধিও লাভ করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিশাস্ত্রে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হবার পাশাপাশি তিনি নিবিষ্ট চিত্তে বিশ্ব ইতিহাস পাঠ করেছিলেন। ড. আম্বেদকর মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, যাঁরা ইতিহাসের কথা বিস্মৃত হন বা সম্যক জ্ঞানের অভাবে পীড়িত হন, তাঁরা কখনোই ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারেন না।

তরুণ ভীমরাও আম্বেদকরের জ্ঞানপিপাসা কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠগ্রহণের মধ্যেই তৃপ্ত হয়নি। পরবর্তীকালে তিনি সুবিখ্যাত লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্‌স উচ্চতর গবেষণা করেছেন। লন্ডন থেকেই আইন বিষয়ক পাঠগ্রহণ করে কৃতিত্বের সঙ্গে ব্যারিস্টার হয়েছেন এবং এসবের পাশাপাশি বিজ্ঞান বিষয়ক পাঠেও কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। একজন তন্নিষ্ঠ বিদ্যানুরাগী এবং জ্ঞানসন্ধানী হিসেবে তিনি বস্তুত তুলনারহিত। তাঁর নামের দৈর্ঘ অপেক্ষা বিদ্যালাভের খতিয়ান অবশ্যই দীর্ঘতর ছিল। এই অত্যুজ্জ্বল ছাত্রটিই পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনায় দেশ বিদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলির ইতিহাস আত্মস্থ করে সেসব ভারতের সংবিধানে সন্নিবেশিত করার উদ্যোগ নেবেন। শিক্ষাগ্রহণ সমাপ্ত হবার পরে তিনি কিছুকাল চুক্তির শর্ত হিসেবে সয়াজিরাও গায়কোয়াডের রাজকর্মচারী হিসেবে কাজ করেছেন। অধ্যাপনাও করেছেন। অর্থনীতিশাস্ত্র ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কৃতী অধ্যাপক হিসেবে খ্যাতিলাভও করেছেন।

স্বাধীনতা সংগ্রাম ও রাষ্ট্রজীবনে আম্বেদকর :

একবিংশ শতকের প্রথম দুই দশককাল অতিক্রান্ত হবার পরেও ভারতের একাংশ মানুষ এখনও সহস্র বছরের সামাজিক রীতি ও সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ অনুগত। তাঁদের কাছে এখনও সমাজবিন্যাসে নিম্নতর স্তরে অবস্থানকারী জনগোষ্ঠী শুধুমাত্র অত্যাচারিত হবার জন্যই রয়েছেন। বিজ্ঞান নির্ভর সমাজ চেতনা অদ্যাবধি বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন। বই পুস্তকে তার উল্লেখ থাকলেও একাংশ জনমানসে তার প্রভাব নেই বললেই চলে। গণতান্ত্রিক মনোগঠনে এবম্বিধ সমস্যা এক দুর্মর বাধা।

দেশের সংবিধানে এইসব পিছিয়ে থাকা সামাজিক অবস্থানে জীবননির্বাহ করা মানুষদের কিছু কিছু সংরক্ষণের সুযোগ দিয়ে মূল ধারায় উন্নীত করার বা মূলস্রোতে মেলানোর বিধান অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু সেই বিধানগুলির বাস্তবায়নে উচ্চজাতির মানুষদের একাংশের প্রকাশ্য বা গোপন অভিসন্ধির জন্য অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করা আজও সম্ভব হয়নি।

অনস্বীকার্য যে, স্বাধীনোত্তর ভারতের প্রশাসন মুখ্যত উচ্চজাতিভুক্ত পণ্ডিত ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রণেই ছিল। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যেমন বিচ্ছিন্নভাবে দু'একজন উচ্চতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব পশ্চাদপদ সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও মূল কর্তৃত্ব তাঁদের ওপর নির্ভর করেনি। তাঁরা কেউ কেউ হয়তো বহু ধরনের জাগতিক সুযোগ সুবিধা পেয়ে মৌলিক পরিবর্তন সম্ভব করতে কোনো দৃঢ় অবস্থানও নেন নি। অন্তত পক্ষে ধারাবাহিকভাবে নিজের সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের সমষ্টিগত উন্নয়ন ভাবনায় ভাবিত হন নি। ফলত, দলিত (তপশিলভুক্ত জাতি গোষ্ঠীকেও এই বিশেষণেই ভূষিত করা হচ্ছে। এই নিবন্ধে পৃথক পৃথক করে উল্লেখের সুযোগ নেই) বা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি 'ক্রীমি লেয়ার' অথবা সম্পন্ন অংশ নির্মিত হয়েছে। সর্বজনীন উন্নয়ন হয়নি। এই কঠোর সত্যটি মনুস্মৃতির বিধানে পরিচালিত ভদ্রলোকেরা মানতেই চান না। আবার এমন সব ভদ্রলোকেরাই এদেশের উচ্চস্তরীয় আমলাতন্ত্রের মুখ্য ভূমিকায় পূর্বাপর অবস্থান করছেন। আমলাতন্ত্রের নিগড় অতিক্রম করা এক দুঃসাধ্য প্রসঙ্গ।

ব্যতিক্রমী এক মহীরূহসম ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমাদের পরিচিতি অবশ্যই ঘটেছে। তিনি ছিলেন স্বমহিমা ও গুণবত্তায় ভাস্বর বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকর। পারিবারিক দারিদ্র এবং নিম্নজাতিভুক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করা এক মানুষ হিসেবে তিনি প্রতিস্পর্ধী মনন নিয়েই জীবনযাপন করেছিলেন। মাথা নিচু করেন নি শত প্রলোভনেও। ভারতের সংবিধান সভায় তাঁর ভূমিকা বিশেষ স্মরণীয়। উল্লেখ্য, সংবিধান সভায় মহামতি জ্যোতিবা ফুলে বা সাবিত্রীবাই ফুলের রাজ্য থেকে তিনি নির্বাচিত হননি।১৯৪৬ সালে তিনি বাংলা থেকে নির্বাচিত সদস্য।

শিক্ষিত হও, সংঘবদ্ধ হও এবং সংক্ষুব্ধ হও :

বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকর দেশের পরাধীনতাকে যেমন অভিশাপ মনে করতেন, একইভাবে তিনি ভারতের বহু শতাব্দী প্রাচীন উচ্চনীচ জাতির অবস্থানকেও এদেশের সমাজ সংগঠনে এক দুর্মর সমস্যা বলে বিবেচনা করতেন। তিনি চেয়েছিলেন নিম্নবর্ণের অসংখ্য মানুষের সসম্মান জীবন। অচ্ছুৎ মানুষদের সমাজের মূল স্রোতে শামিল করার আন্দোলনকে তিনি সমধিক গুরুত্ব সহকারে এগিয়ে নিতে সদা সক্রিয় ছিলেন। গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুব খারাপ না থাকলেও গান্ধীজির হরিজন প্রেমে কাতর হয়ে রামধুন গান তিনি খুব একটা পছন্দ করতেন না। তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য ছিল, নিম্নবর্ণের মানুষদের জন বিশেষ সুযোগ সুবিধার সম্যক ব্যবস্থা না করতে পারলে দুই ধরনের ভারতের বাস্তবতা পাল্টানো যাবে না। দু'টো ভারত দীর্ঘকাল পাশাপাশি রয়েছে। ভারতের অধিবাসীদের ওপর সামাজিক বিচারে প্রাগ্রসর জাতির ঘৃণা অবহেলা ও অসহিষ্ণুতা চলমান। অনবরত বহুসংখ্যক অন্ত্যজ মানুষের ওপর সেসব বর্ষিত হয়েই চলবে, আর দেশ আলোর পথযাত্রী হবে তা, কদাপি সম্ভব নয়। এই বোধ তাঁকে সর্বদা সংক্ষুব্ধ করেছে।

ড. আম্বেদকর নিজের কৃতিত্বে অনন্য শিক্ষার অধিকারী হলেও তাঁর পরিবার সমাজ ও গোষ্ঠীর প্রতি নিয়ত অবমাননা মেনে নেন নি। বিদ্রোহ করেছিলেন মান্ধাতা আমলের সব সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে। তিনি চেয়েছিলেন সকলের সমান অধিকার। অর্থনৈতিক বিচারে পশ্চাদপদ মানুষেরা অধিকাংশই জাতিগত দিক থেকেও পশ্চাদপদ। তাঁদের শিক্ষার অধিকার নেই। জীবিকা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তাঁদের বংশানুক্রমিক পেশাই একমাত্র অবলম্বন বলে মনে করতে বাধ্য করা হত।

এর পর ৬ পাতায়

বাবাসাহেব আম্বেদকর

৫-এর পাতার পর

এখনও, একবিংশ শতকের দুই দশককাল অতিক্রান্ত হবার কালেও তা সম্পূর্ণত অবসিত হয়নি। অচ্ছুৎ পরিবারে জন্মগ্রহণের কারণেই একজন মানুষের সাধারণভাবে উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখাও গর্হিত অপরাধ বলে গণ্য হত। উচ্চজাতির অনেকেই শাস্তি বিধানও করতেন। অকথ্য অত্যাচারের মুখে পড়তে হত বহুসংখ্যক পশ্চাদপদ জাতির নরনারীকে। এমন অভিশপ্ত বাস্তবতা এখনও বহুসংখ্যক পিছিয়ে থাকা সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনে প্রবহমান।

ভীমরাও আম্বেদকর নির্দিষ্টভাবে দাবি করেছিলেন যে, দলিত সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর জন্য পৃথক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা হওয়া উচিৎ। সমস্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিতভাবে দলিত প্রতিনিধিত্বের বিধান তিনি (আম্বেদকর) যথার্থ বলে স্বীকার করতেন না। এ প্রসঙ্গে গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর তীব্র মতবিরোধ ত্রিশের দশকের আগে থেকেই। তীক্ষ্ণ যুক্তিজাল রচনা করে আম্বেদকর তাঁর মতামত সম্পর্কে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন।

১৯৩১ সালে সেই ঐতিহাসিক বিতর্ক গান্ধীজির কর্তৃত্বকেই চ্যালেঞ্জ করে বসে। আর এই সত্য সুবিদিত যে, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের যে উচ্চতায় গান্ধীজি অধিষ্ঠান করতে শুরু করেছিলেন তা থেকে এতটুকু সরে এলেই তিনি (গান্ধীজি) জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব থেকে নীরবে সরে দাঁড়ানোর মনোভাব প্রকাশ করতেন। ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলনকালে উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরায় ব্রিটিশ বিরোধী বিদ্রোহী জনগণের থানায় আগুন লাগানোর ঘটনায় অসন্তুষ্ট গান্ধীজি আন্দোলনের মূল নেতৃত্ব থেকেই নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। এমন আরও উদাহরণ উল্লেখ করা যায়। মনে হয়, স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি পর্যায়ে গান্ধীজি নিজেকে অপরিহার্য এবং প্রায় তাঁর আরাধ্য ঈশ্বরের অবতার বলে মনে করতে শুরু করেছিলেন। নিঃসন্দেহে তিনি অতি উচ্চতাসম্পন্ন এক নেতা ছিলেন। কিন্তু কোনো অবতার বলে নিজেকে অপরিহার্য হিসেবে মনে করা কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য ছিল না। তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতা এবং কর্মীরা গান্ধীজির এই মনোভঙ্গিকে বিশেষ মর্যাদা দিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। ড. আম্বেদকর এ অবস্থাটি মেনে নেন নি।

বাবাসাহেব প্রস্তাব করেছিলেন স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক পরিসরে দলিত অংশের নির্দিষ্ট প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। অন্যান্য অংশের মানুষদের সঙ্গে মিলিয়ে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর অবস্থান নিরূপণ করা অসঙ্গত। এই বিতর্ক গান্ধীজির পিছু ছাড়ে নি। বাবাসাহেবকে উপেক্ষা করা কিংবা অবহেলা করাও সম্ভব ছিল না। তিনি সেই সময়কালে বিশেষ উচ্চতায় উত্তীর্ণ। গোঁজামিল দিয়ে বিতর্কের অবসানও সহজ ছিল না। গান্ধীজি সুকৌশলে সেই কাজটিই সমাধা করলেন পুনা চুক্তি (১৯৩২)র মাধ্যমে। বাবাসাহেব আম্বেদকর তাঁর স্ববর্ণ মানুষদের মৌলিক অধিকার কিছুটা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন বলে অনেকে ধারণা করেন।

সংবিধান সভায় দীর্ঘ অনুশীলন অধ্যবসায় তথ্যানুসন্ধান প্রভৃতির নিবিড় প্রয়োগের পর যখন দেশের জনগণকে তাঁদের একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান উপহার দিলেন তখন বা তার পরবর্তী কালে বাবাসাহেব স্বয়ং বেশ সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, পশ্চাদপদ জাতি ও উপজাতির মানুষদের সসম্মান জীবনের অধিকার অধরা রয়ে গেল। দেশের লোকসভায় তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ হলেও তা যথাযথ হল না। পঞ্চাশ শতাংশ বা তার বেশি সংখ্যায় তপশিলভুক্ত মানুষদের বসবাস সমন্বিত স্থানগুলি চিহ্নিত করা হয়েছিল তাঁদের লোকসভায় পৌঁছনোর নির্বাচন কেন্দ্র হিসেবে। একইভাবে আদিবাসী মানুষদের জন্যও অনেকগুলি আসন সংরক্ষিত করার বিধান দিল সংবিধান। বাবাসাহেব আম্বেদকর ১৯৫২ এবং ১৯৫৪ সালের দু'টি নির্বাচনেই সংরক্ষিত আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা মারফৎ লোকসভায় যেতে পারলেন না। ১৯৫৬ সালে বিমর্ষ বাবাসাহেবের প্রয়াণ। তার আগেই তিনি নাগপুর অঞ্চলে সদলবলে পৌঁছে মনুসংহিতা নির্ভর হিন্দু ধর্মের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন। জাতের নামে বজ্জাতির যন্ত্রণা আর তিনি সহ্য করতেই পারছিলেন না।

পুনা চুক্তি ও সংরক্ষণ প্রসঙ্গ : ১৯৩২ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড ঘোষণা করেছিলেন যে, ভারতের বহুসংখ্যক মানুষকে যেমন ব্রিটিশরাজের প্রশাসন পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত করা ও পরিচিত করা প্রয়োজন তেমনি, ভারতে যে সংখ্যায় অবদমিত শ্রেণি বা পশ্চাদপদ শ্রেণির (Depressed Class) মানুষ রয়েছেন, তাঁদের জন্য এক নির্দিষ্ট ও পৃথক নির্বাচক মণ্ডলী গঠন করতে হবে। ম্যাকডোনাল্ড সাহেব ড. আম্বেদকরের সামাজিক আন্দোলন সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন কিনা তা, সঠিকভাবে জানা নেই।

মোহনদাস কর্মচন্দ গান্ধী মনে করেছিলেন যে, এই ধরনের পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর অস্তিত্ব হিন্দু ধর্মাবলম্বী বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে। হিন্দুরা সেই অর্থে দুর্বল হয়ে পড়বেন। সংখ্যাগত বিচারে উচ্চবর্ণভুক্ত হিন্দুর সংখ্যা তখনও কমই ছিল। অতএব র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের প্রস্তাব মেনে নিতে তিনি কোনভাবেই সম্মত ছিলেন না। বিতর্ক বেধে যায় ড. আম্বেদকরের সঙ্গে। গান্ধীজি তখন পুনার ইয়েরওয়াদা কারাগারে অন্তরীন। তিনি কারাগারে বসেই অনশন সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এটা গান্ধীজির পরিচিত ও সুবিদিত পন্থা হিসেবেই অনুসৃত হত।

জাতীয় কংগ্রেস দলের মধ্যে হিন্দুস্বার্থ রক্ষায় উদ্‌গ্রীব অংশ বিচলিত বোধ করেছিলেন। তাদের অন্যতম কট্টর নেতা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য আসরে নামলেন গান্ধী-আম্বেদকারের বিতর্ক ও বিবাদ সমাধানে। ইয়েরওয়াদা জেলের মধ্যেই আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই উদ্যোগে মালব্যজির সঙ্গে ছিলেন জনৈক পালোয়ানকর বালু। আম্বেদকরের সঙ্গে গান্ধীজির নিবিড় বিতর্ক শেষে ২৪-২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩২ একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এই চুক্তি পুনা শহরে স্বাক্ষরিত হবার কারণেই পরবর্তীকালে পুণা চুক্তি নামেই অভিহিত।

পুনা চুক্তি মারফৎ সংরক্ষণ ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়েছিল। পৃথক নির্বাচক মণ্ডলী কিংবা শুধুমাত্র অবহেলিত বা অবদমিত শ্রেণির মানুষদের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর প্রস্তাবটিও পরিত্যক্ত হয়। ব্রিটিশ সরকার প্রস্তাবিত 'কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড' সূত্রে আইন প্রণয়নকারী সংস্থায় যে ৭১টি আসন সংরক্ষিত হবার প্রস্তাব ছিল তা, বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৮টি কেন্দ্র স্থির হয়। অনেকে মনে করেন, আম্বেদকর ও গান্ধীর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। বাবাসাহেব গান্ধীজিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন নি। তিনি ওই সময়কালে গান্ধীজির শারীরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন। গান্ধীজির হিন্দুধর্মবিশ্বাসী মানুষদের প্রতি দায়বদ্ধতা উপলব্ধি করলেও বাবাসাহেব কিছুটা নরম মনোভাবই দেখিয়েছিলেন। তিনি সম্ভবত এও বুঝেছিলেন যে, পুনা চুক্তি অবশেষে দলিত মানুষদের সহস্র বছরের সমস্যার সমাধানে বিশেষ কার্যকর হবে না। আবার গান্ধীজি অত্যন্ত চতুরের মতো বাবা সাহেবের আবেগ প্রশমিত করে তাঁকে প্রকৃত পক্ষে ঠকিয়েছিলেন কিনা তা নির্দিষ্টভাবে বলা যাবে না। রাজনৈতিক দাবার চালে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর কৃতিত্বপূর্ণ বিচরণ সম্পর্কে সচেতন থেকেও তাঁকে প্রবঞ্চক বলা সম্ভবত একটু বেশি কটুবাক্য হয়ে যাবে।

পুনা চুক্তি স্বাক্ষর কালে বাবাসাহেব নানাবিধ কারণে যে আপসরফায় সম্মত হয়েছিলেন তার ফলাফল তিনি নিজের জীবনে বিশেষভাবে টের পেয়েছিলেন। ভাইসরয় কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে তিনি স্বাধীন দেশের সংবিধান সভায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী যে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার গঠিত হয়েছিল সেগুলিতে এই কৃতবিদ্য মানুষটির তেমন কোনো স্থান ছিল না। তিনি ১৯৫২ থেকে কিছুকাল রাজ্যসভার সাংসদ ছিলেন। কিন্তু দেশের সংবিধান রচয়িতা বলে এমন বিখ্যাত মানুষটি কোনকালেই লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হতে পারেন নি। ১৯৫২ সালে বম্বে (মুম্বাই) উত্তর-মধ্য কেন্দ্রে তিনি পরাজিত। আবার ১৯৫৪ সালে ভান্ডারা (বর্তমানে ভান্ডারা- গোন্দিয়া) কেন্দ্র থেকেও পরাস্ত হয়েছিলেন। এর মাত্র দু বছর পরেই বাবাসাহেবের দেহাবসান ১৯৫৬ সালের ৬ ডিসেম্বর। লোকসভায় উপস্থিত হয়ে যে তীক্ষ্ণ বিতর্কের সূত্রপাত করে তিনি দেশের বিপুল সংখ্যক অবদমিত জাতি উপজাতিভুক্ত মানুষদের জন্য সদর্থক ভূমিকা পালন করতে পারতেন, তা অধরাই থেকে গেল। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ভীমরাও আম্বেদকর মহারাষ্ট্রের চৈত্যভূমিতে সমাধিস্থ হয়েছিলেন।

তাঁর আদর্শ ও জীবনাচরণ সম্পর্কে তেমন কোনো উৎসাহ না দেখিয়ে তাঁকে আরাধ্য মহাপুরুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে স্বাধীনোত্তর ভারত রাষ্ট্র। দরিদ্র, অতি দরিদ্র বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনে আজও ঈপ্সিত উন্নয়ন সম্ভব হয়নি। সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু হলেও উচ্চবর্ণের মানুষদের সঙ্গে মিলিতভাবে ৫০ শতাংশ তপশিলভুক্ত জাতি ও জনজাতির সম্মিলনে চিহ্নিত লোকসভা কেন্দ্রগুলি থেকে যাঁরা নানা সময়ে নির্বাচিত হয়ে লোকসভার সদস্য হয়েছিলেন, তাঁরাও সম্ভবত নির্বাচনে জয়লাভ সম্ভব করার বাসনায় মত্ত থেকেছেন। যে অনড় ভূমিকা নিয়ে অবদমিত শ্রেণিভুক্ত মানুষদের স্বার্থ রক্ষায় অগ্রসর হতে পারতেন তা পারেন নি। উচ্চজাতির মানুষদের রোষ তাদের নির্বাচনে বিপদে ফেলতে পারে বলে মনে করেছেন। সংরক্ষিত আসনগুলিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সাংসদ হয়েছেন অনেকেই। অবদমিত জনসংখ্যার মধ্যে অনেকেই 'ক্রীমি লেয়ার' বা প্রচুর সুবিধাপ্রাপ্ত হয়ে ধনসম্পদের অধিকারী হয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্যের সঙ্গে ধারাবাহিক বিশ্বাসঘাতকতা হয়েই চলেছে। সোনার চাঁদ বা সোনার টুকরো (SC/ST) বলে উপহাসের প্রসঙ্গ তুলেছে উচ্চজাতির অনেকে। কিন্তু সংরক্ষণের দীর্ঘকালীন সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ঈপ্সিত লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব হয় নি। এ বেদনা অন্তহীন।

পরিশেষে অতি সংক্ষেপে একটি গভীর ক্ষোভের বিষয় উল্লেখ করেই এই নিবন্ধটি শেষ করতে চাই। অনেকেই জানেন যে, ড. আম্বেদকরের সমস্ত রচনাগুলি গ্রন্থনা এবং সম্পাদনা করেছেন তাঁরই উত্তরপুরুষ ড. আনন্দ তেলতুম্বদে। অসাধারণ যোগ্যতাসহ উচ্চ কারিগরীশিক্ষা সমাপ্ত করে ড. তেলতুম্বদে নিবিষ্টচিত্তে সামাজিক ও মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলনে যুক্ত। ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী প্রায়শই নিজেকে নিম্নবর্গের মানুষ এবং ড. আম্বেদকরের ভাবশিষ্য হিসেবে জাহির করার চেষ্টা করেন। আর তাঁরই প্ররোচনায় ড. আনন্দ তেলতুম্বদে, যিনি ড. আম্বেদকরের ভাবাদর্শ বহন করেন এবং প্রচার করেন, তাঁকে সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগে দানবীয় ইউ এ পি এ প্রয়োগ করে বছরের পর বছর কারান্তরালে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। ব্যক্তি আম্বেদকরের সাড়ম্বর পূজা এবং তাঁর ভাবাদর্শ জনমানস থেকে মুছে দিয়ে ঠিক বিপরীত পথে চলার অপচেষ্টায় রত বর্তমান মনুস্মৃতি নির্ভর উগ্র হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকার। দেশের সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের এমন অপরাধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া একান্তই কাম্য।

৩১ মার্চ, ২০২২ (আম্বেদকর স্মরণিকায় প্রকাশিত)

দার্জিলিং ও আলিপুরদুয়ার জেলায় নিখিলবঙ্গ মহিলা সংঘের কর্মীসভা

৩-এর পাতার পর

সরকারের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে ধর্ষণ, খুন এবং দুর্নীতি বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে রাজ্যে আর কোনো গণতন্ত্রের শাসন বলে কিছু নেই। নিখিলবঙ্গ মহিলা সংঘ পথে নেমেই এই অবস্থার মোকাবিলা করতে বদ্ধপরিকর বলে তিনি জানান। এরপর সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা কম. সর্বানী ভট্টাচার্য বলেন, আজকে সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপার যে মহিলারা ভয়ংকরভাবে কাজ হারাচ্ছে, পুরুষদের চেয়ে তা অনেক বেশি। অন্যদিকে যেখানে কাজও আছে সেখানে মহিলারা সমান কাজে সমান মজুরি পাচ্ছেন না। করোনার সময় যারা কাজ হারিয়েছিল তারা বেশিরভাগই আর কাজ ফিরেও পাননি। রাজ্য ও কেন্দ্র উভয় সরকারই এ ব্যাপারে একেবারেই নিশ্চুপ ও নির্লিপ্ত। মনে রাখতে হবে সমস্যা যত বাড়ছে মহিলাদের উপর আক্রমণও তত প্রবলভাবে নেমে আসছে। দেশজুড়ে এবং অবশ্যই আমাদের রাজ্যেও বাল্যবিবাহ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ এক অদি জটিল সমস্যা। আর যতই বাল্যবিবাহ বাড়ছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে পাচার। এসবের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে নিয়ে সংগঠন গড়ে তুলে জেলায় জেলায় আন্দোলন গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক ও আর এস পি'র রাজ্য কমিটির সদস্য কম. নির্মল দাস বলেন যে, প্রশাসনিক সুবিধার জন্য এখানে তিনটি মহকুমার দাবি দীর্ঘদিনের। কিন্তু সরকার সে ব্যাপারে উদাসীন। একইসঙ্গে তিনি এও বলেন যে চা বাগানের শ্রমিকরা যার মধ্যে বেশিরভাগই মহিলা তারাও ন্যূনতম মজুরি থেকে বঞ্চিত। এর বিরুদ্ধে নিখিল বঙ্গ মহিলা সংঘকে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করার কথা বলেন। এছাড়া জেলা কার্যকরী কমিটির সদস্য সুব্রত রায় বলেন এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মহিলারা ঘরে-বাইরে সর্বত্র শোষিত। করোনাকালে সেই শোষণ আরো বেড়েছে; এর বিরুদ্ধে সংগঠন এবং আন্দোলন গড়ে তুলবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। কর্মীসভা থেকে শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি, টোটো জনজাতির উচ্চশিক্ষার জন্য মাদারিহাটে ল কলেজ স্থাপন, পুরসভায় উন্নত ও লতা বাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নত করার দাবি ওঠে। মহিলা সংঘের অন্যান্যদের মধ্যে বক্তা হিসেবে ছিলেন পাপিয়া ভট্টাচার্য, মমতা ভট্টাচার্য, ঝর্ণা দাস ও সঙ্গীতা ব্যানার্জি প্রমুখ। কম. মদিনা বেগমকে আহ্বায়িকা করে ১৫ জনের একটি প্রস্তুতি কমিটি তৈরি হয়।

অগ্নিপথ : বেসরকারিকরণের পথে কর্পোরেটতন্ত্র কায়েমের প্রকল্প

মৃন্ময় সেনগুপ্ত

গত ১৪ জুন দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ সেনবাহিনীতে নিয়োগের জন্য অগ্নিপথ নামে একটি প্রকল্প ঘোষণা করলেন। একই দিনে প্রধানমন্ত্রী আগামী দেড় বছরের মধ্যে দশ লক্ষ কর্মসংস্থানের কথা ঘোষণা করেন। বছরে দুই কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি এখন দশ লক্ষেরও কম নিয়োগের প্রতিশ্রুতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চয়ই অগ্নিপথ প্রকল্পে দেশের তরুণদের মন জয়ের আশা করেছিল। কিন্তু, প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় স্পষ্ট বোঝা গেল ফল হয়েছে উলটো। পরের দিন থেকেই হিন্দি বলয়সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যুব সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ বোধহয় সরকারের কাছে প্রত্যাশিত ছিল না। দেশের কোটি কোটি বেকারের নিরাপত্তাহীনতা কোন চরম পর্যায়ে অবনত হয়েছে, তা এই ঘটনায় স্পষ্ট হয়েছে।

সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে লক্ষ লক্ষ পদ শূন্য রয়েছে। অতিমারিকে অস্ত্র করে দেশজুড়ে চলছে ছাঁটাই, নিয়োগ বন্ধ, বেসরকারিকরণের সর্বনাশা খেলা। অতিমারি আজ রাষ্ট্র আর কর্পোরেটদের কাছে সবচেয়ে বড় যুদ্ধাস্ত্র। যে অস্ত্র ব্যবহার করে দেশের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে ওরা যুদ্ধ করে চলেছে। আদানি, আম্বানির মতো কর্পোরেটদের আরও ধনী বানাতে আমজনতার সর্বনাশের আয়োজন। অতিমারির আর্থিক প্রভাব আমজনতা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারে নি। কর্মজগতে অনেকেই ফিরে যেতে পারেন নি। কোটি কোটি মানুষের জীবিকা হারিয়েছে বা বদলেছে। বেড়েছে কাজের নিরাপত্তাহীনতা। আশেপাশের সহনাগরিকদের তথ্য সংগ্রহ করলেই এই ভয়াবহ চিত্র আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না।

সরকারি দপ্তরগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিয়োগ হয় রেলে। কৌশলে বেসরকারিকরণের পথে সেখানেও কর্মীসংখ্যা কমানো হচ্ছে। স্টেশন, ট্রেন, টিকিট কাউন্টার দিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন বেসরকারি কোম্পানির হাতে। সেনবাহিনীতে কাজ করার স্বপ্ন অনেকেই হয়তো দেখেন। সেনাবাহিনীতেও এভাবে চুক্তির ভিত্তিতে স্বল্পমেয়াদে নিয়োগে বেকারদের ক্ষোভ স্বাভাবিক। মন্দির-মসজিদ, নূপুর শর্মার মতো মৌলবাদী ইস্যু গৌণ করে দিয়ে যুব সমাজের এই আন্দোলন, তথাকথিত ফ্যাসিবাদ বিরোধী সেনাপতিদের কাছেও অপ্রত্যাশিত ছিল। আবার প্রমাণিত হল, রোটি, কাপড়া, মকানের লড়াই মৌলবাদকে রুখে দিতে পারে।

অগ্নিপথ প্রকল্পে ১৭ বছর থেকে ২৩ বছরের যুবকরা কাজের সুযোগ পাবেন। প্রথমে বয়সের উর্ধসীমা বলা হয়েছিল, ২১ বছর। আন্দোলনের চাপে দুদিন পরেই তা বাড়িয়ে ২৩ বছর করা হয়েছে। চার বছর পর তাঁদের কর্মচ্যুতি। অর্থাৎ মাত্র চার বছরের জন্য নিয়োগ। প্রথম বছরে তাঁরা পাবেন মাসে ৩০ হাজার টাকা ও ভাতা। তবে হাতে পাবেন ২১ হাজার টাকা। প্রতি বছর এই বেতন বেড়ে চতুর্থ বছরে হবে, ৪০ হাজার টাকা। হাতে পাবেন, মাত্র ২৮ হাজার টাকা। অবসরের শেষে তাঁদের ১১ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা দেওয়া হবে। এই টাকার পুরোটা সরকার দেবে না। একটা বড় অংশ কিন্তু, আগেই মাসে মাসে অগ্নিবীরদের থেকে কেটে নেওয়া হবে। অবসরের পর পেনশন, গ্র্যাচুইটি ইত্যাদির কোনো ব্যবস্থাই নেই।

সরকারি-বেসরকারি সংস্থায় স্বল্পমেয়াদে অল্প বেতনে কাজ করিয়ে নেওয়া, অবসরকালীন সুযোগ না দেওয়ার নয়া উদারনীতি এবার সেনাবাহিনীতেও গ্রহণ করা হচ্ছে। অবসরের পর এই অগ্নিবীরদের মাত্র ২৫ শতাংশকে সেনাবাহিনীতে নেওয়া হবে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, বাকি ৭৫ শতাংশ, যাদের বয়স হবে সাড়ে ২৫ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে তাঁদের কী হবে? আন্দোলনের চাপে নানা বাহিনী ও সরকারি দপ্তরে তাঁদের জন্য ১০ শতাংশ আসন সংরক্ষণের কথা সরকার ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে। যদিও, সরকারি নিয়োগ যেখানে কার্যত বন্ধের মুখে, সেখানে কতজন অবসরের পর কাজ পাবেন তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। প্রথম বছরে এই প্রকল্পে মাত্র ছেচল্লিশ হাজার জনকে নিয়োগ করা হবে। ধীরে ধীরে সেনাবাহিনীতে স্থায়ী নিয়োগ কমানোর ষড়যন্ত্র স্পষ্ট।

স্বাভাবিকভাবেই সরকারের এই নীতির পক্ষে-বিপক্ষে নানা মত উঠে আসছে। অনেকেই বলছেন যে, অনেকদিন ধরেই এই নীতি গ্রহণের কথা আলোচনা হচ্ছিল। অতিমারিতে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ বন্ধের সময়ে সেই ভাবনা গতিলাভ করে। যে সরকার প্রতিদিন দেশের নিরাপত্তা নিয়ে এত ভাষণ দেয়, প্রতিবাদীদের দেশদ্রোহী বলে বছরের পর বছর কারাবন্দি রাখার ব্যবস্থা করে, সেই দেশপ্রেমিক সরকারের এই পদক্ষেপে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

সেনাবাহিনীর কর্তারা সরাসরি সরকারের নীতির পক্ষে প্রচারে নেমেছেন। যাঁরা অগ্নিপথে আবেদন করবেন, তাঁদের মুচলেকা দিতে হবে যে, হিংসাত্মক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁরা যুক্ত ছিলেন না। আন্দোলন দমনের অস্ত্রে শান দিচ্ছে সেনাবাহিনী। বুলডোজার সরকারের আমলে সেনাবাহিনীর নিরপেক্ষতা বজায় থাকছে না। সেনা, বিচার ব্যবস্থা, নানা তদন্তকারী সংস্থা, মিডিয়া, সরকার—সব মিলিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিটি স্তম্ভ আজ এক সুরে কথা বলছে। সুর নির্মাণ করে দিচ্ছে কর্পোরেট দুনিয়া।

গণতান্ত্রিক ভারত আজ ফ্যাসিবাদী মতাদর্শকে হাতিয়ার করে কর্পোরেটতন্ত্রে রূপান্তরিত হতে মরিয়া। তাই বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থাও এই প্রকল্পের সমর্থনে সরাসরি প্রচার করছে। নোট বন্দি, কৃষি আইনের বিতর্ককে কেন্দ্র করেও কর্পোরেট দুনিয়ার এমন খোলামেলা সমর্থনের দৃষ্টান্ত নেই। গণতন্ত্রের পক্ষে এরচেয়ে বিপজ্জনক আর কী হতে পারে!

অল্পবয়সী তরুণদের সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা অগ্নিপথ প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য। যা আগামীদিনে সঙ্ঘ পরিবারের মতাদর্শ অনুসারী ফ্যাসিবাদী বাহিনীতে পরিণত হতে পারে। সে কারণেই সঙ্ঘ পরিবার তাঁদের লোকেদের এই প্রকল্পে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। সামরিক বাহিনীর সঙ্ঘীকরণের পথ অনেকটাই মসৃণ হল। দেশের নানা প্রান্তে সঙ্ঘ পরিবারের শাখা সংগঠনগুলো প্রকাশ্যেই সশস্ত্র প্রশিক্ষণের শিবির পরিচালনা করে। এখন রাষ্ট্রীয় প্রক্রিয়ার মধ্যে সেই প্রশিক্ষণ চলবে।

১৯৩৩ সালে জার্মানিতে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে এমনটাই করেছিল হিটলারের নাৎসি বাহিনী। ক্ষমতা লাভের তিন মাস পরেই বার্লিনে হয়েছিল বই পোড়ানোর উৎসব। জার্মান বিরোধী তকমা দিয়ে হাজার হাজার বই পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নাৎসি বাহিনীর স্বৈরতন্ত্র। মগজে কারফিউ জারির জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে মুক্ত চিন্তার পরিবেশকে পুরোপুরি ধ্বংস করা হয়েছিল। আজ ভারত তথা এই বাংলার অবস্থা ধীরে ধীরে কি সেদিকেই এগোচ্ছে না?

শিশুদের সামরিক শিক্ষা ও ফ্যাসিবাদী মতাদর্শে প্রশিক্ষিত করতে সেদিন জার্মানিতে শিক্ষাব্যবস্থা পুরোপুরি বদলে দেওয়া হয়। ছয় বছর বয়স থেকেই শিশুদের শিবিরে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। বারো বছর বয়স থেকে যোগ্য ছাত্র-ছাত্রীদের দেওয়া হত নাৎসি বাহিনী ও সিভিল সার্ভিসে নেতৃত্বদানের প্রশিক্ষণ। তারপর চলত সামরিক প্রশিক্ষণ। হিটলার, মুসোলিনির ভারতীয় চ্যালারা আজ সেই পথেই দেশকে নিয়ে যেতে চলেছে।

মার্কিন সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন দেশে সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা তো সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। এভাবেই আফগানিস্থানের বামপন্থী রাষ্ট্রনায়ক ডা. নাজিবুল্লাহকে ক্ষমতাচ্যুত করতে জঙ্গিদের মার্কিন বাহিনী প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। আজকের তালিবানদের উত্থানের দায় তাই মার্কিন রাষ্ট্র এড়াতে পারে না। নয়া উদারনীতির অঙ্গ হিসেবেই বিভিন্ন দেশে সামরিক ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়া চলছে। সামরিক বাহিনীতে চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগের পাশাপাশি চলছে, বেসরকারি সামরিক বাহিনী থেকে নিয়োগের কাজ। যার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে কোটি কোটি মার্কিন ডলারের যুদ্ধাস্ত্রের কারবার।

শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির মতো সামরিক বাহিনীতেও লোক নিয়োগ কমিয়ে, অত্যাধুনিক যন্ত্রের জন্য (পড়ুন, যুদ্ধাস্ত্র) খরচ বাড়ানো হচ্ছে। শ্রমিক-কর্মচারী নিয়োগে খরচ বেশি হওয়ার প্রচারের মতো, এখানেও সামরিক বাহিনীর জন্য কত খরচ হয়, তার প্রচার চলছে। প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় কিন্তু কমছে না। সামরিক বাহিনীতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের খরচ কমিয়ে, যুদ্ধাস্ত্রে খরচ বাড়ানো হচ্ছে। যার সঙ্গে দেশ-বিদেশের কর্পোরেট দুনিয়ার স্বার্থ সরাসরি জড়িত। রাফায়েলের বরাদ্দ তাই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা হ্যালের বদলে অনিল আম্বানি গোষ্ঠীকে দেওয়া হয়। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ হয়।

সাম্প্রতিক অতীতে ইরাক আক্রমণের সময়ে মার্কিন রাষ্ট্রনেতা, বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থাগুলির আঁতাতের ভূমিকা নিয়ে অভিযোগ উঠেছিল। চুক্তিভিত্তিক সেনা নিয়োগ আসলে সামরিক বাহিনীর বেসরকারিকরণের প্রাথমিক পদক্ষেপ। কর্পোরেট সংস্থাগুলি তাই রাখঢাক না করেই, সরকারের নীতিকে সমর্থন জানাতে এগিয়ে এসেছে।

কর্পোরেট সংস্থাগুলির সমর্থনের আরেকটি বড় কারণ হল প্রশিক্ষিত বাহিনীর যোগান। অগ্নিবীরদের নিরাপত্তা কর্মী হিসেবে নিয়োগ করা হবে। কম বয়সের প্রশিক্ষিত কর্মী পাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ। বলাই বাহুল্য, অধিকাংশই চুক্তির ভিত্তিতে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হবেন। এখন যারা নিরাপত্তা কর্মী হিসেবে নিযুক্ত আছেন, তাঁদেরও চাকরির নিরাপত্তা বিপন্ন। কর্মপ্রার্থী বাড়লে, বাজার অর্থনীতির নিয়মে মজুরিও কমবে। সরকারি খরচে প্রশিক্ষিত হবেন আগামীদিনের কর্পোরেট জগতের ঠিকা শ্রমিকরা। করোনা অতিমারিতেই কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করেছে। সেখানেও আজকের প্রযুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দক্ষ শ্রম বাহিনী গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উচ্চশিক্ষা যেমন সকলের জন্য নয়, তেমন স্নাতক স্তরেও পুরো কোর্স শেষ না করেও, স্বীকৃতির ব্যবস্থা রয়েছে। তিন বছর কোর্স শেষ হলে কেবল ডিগ্রি নয়। এক বছর পড়লেই সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে। দু'বছর পড়লে ডিপ্লোমা। ঠিক তেমনই আঠারো বছরের যুবক লেখাপড়া ছেড়ে চার বছরের জন্য সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত হবে। অগ্নিপথ যেন এক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। প্রশিক্ষিতরা আগামী দিনের শ্রমিক। দেশের সামরিক বাহিনী, প্রতিরক্ষার সঙ্গে যার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। দেশজোড়া বেসরকারিকরণ ও সস্তার শ্রমবাহিনী গড়ার রাষ্ট্রনীতির থেকে অগ্নিপথ প্রকল্প বিচ্ছিন্ন নয়। এই নীতিরই অঙ্গমাত্র। সামরিক বাহিনীর বেসরকারিকরণের পথে কর্পোরেটতন্ত্র গড়ার অস্ত্র। অগ্নিপথ বিরোধী আন্দোলন তাই সকলে জন্য শিক্ষা ও স্থায়ী কাজের দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। কর্পোরেটরাজের বিরুদ্ধে আন্দোলনই একমাত্র পারে এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে।

আর ওয়াই এফের হুগলী জেলা কাউন্সিল

গত ১৯ জুন কোন্নগর আর ওয়াই এফের হুগলী জেলা কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে যুব মিছিল এলাকা পরিক্রমা করে। এরপর সংগঠনের রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন আর ওয়াই এফ রাজ্য সহ সম্পাদক কম. আদিত্য জোয়ারদার। নেতৃবৃন্দের শহিদ বেদিতে মাল্যদানের পর অধিবেশন শুরু হয়। উদ্বোধন করেন প্রাক্তন যুবনেতা ও আর এস পি জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কম. কিশোর সিং। খসড়া সাংগঠনিক প্রতিবেদন পেশ করেন হুগলী জেলা সম্পাদক কম. বিপ্লব মজুমদার। প্রতিবেদনের ওপর বিভিন্ন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। আর ওয়াই এফের কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেন কম. আদিত্য জোতদার। বক্তব্য রাখেন আর এস পি জেলা সম্পাদক কম. মৃন্ময় সেনগুপ্ত, অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে কম. ভবতোষ ঘোষ। গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন ক্রান্তি শিল্পী সংঘের কম. সুব্রত মুখার্জী। কম. শঙ্কর চক্রবর্তীকে সভাপতি ও কম. বিপ্লব মজুমদারকে সম্পাদক করে জেলা কমিটি গঠিত হয়।

কবি আর স্ক্যাভেঞ্জার

যশোধরা রায়চৌধুরী

কেউ কি তলিয়ে ভাববে,
ব্যথাবিষে ফের নাববে
কোমরে ত্রাণের দড়ি
যেভাবে নর্দমা থেকে বালতি করে তুলে
আনে ওরা

কেউ কি তলিয়ে ভাববে
অস্তিত্বের নিচে নাববে
মিথেনের কটুঝাঁঝে
যেভাবে ফুসফুস যায় রুদ্ধ হয়ে, তবু নাবে
ওরা

গোল ম্যানহোল থাকে
মানুষ নামবেই পাঁকে
জেনেবুঝে সুয়ারেজ তৈরি করে খোকা

পাঁক চুঁড়ে তুলে আনা
কিছু কাব্য কিছু সোনা
তারপর শ্বাসরুদ্ধ ডুবে মরে বোকা।

Vol. 70 Issue No. 17 শনিবার ২৫ জুন, ২ জুলাই ২০২২ (যুগ্ম সংখ্যা) আট
RN No. 2710/57 Rupees Five [By Air Rs. 6.50]
Phone : 2229-4653; e-mail : kranti.press@yahoo.com

প্রসঙ্গ : ইউক্রেন নিয়ে জুয়া খেলার কূটনীতি পরিহার করা সম্ভব ছিল

১৯৬২ সালে কিউবায় মিসাইল সঙ্কটের সময় মানব সভ্যতা প্রায় ধ্বংসের কিনারায় পৌঁছেছিল। বর্তমান সময়ে ইউক্রেন যুদ্ধের পরিণতি কী হবে বলা যাচ্ছে না। এই যুদ্ধ যদি চলতে থাকে সারা বিশ্ব কী সেই ভয়ঙ্কর শেষ দিনের দিকে যাচ্ছে? এখনও এমন সম্ভাবনা সুদূর পরাহত মনে হলেও, যুদ্ধ বন্ধ না হলে, আপাত অসম্ভব সেই শেষ দিনটা সম্ভব হতেও পারে।

প্রসঙ্গত, একটা তুলনা করা যেতে পারে। ১৯৬৩ সালের কিউবায় সঙ্কটের সময়ে বিশ্বের দুই মহা শক্তির নেতৃত্বের আসনে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের তুলনায় এই দুই মহাশক্তিকে যাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁদের নিতান্তই ছোট মাপের মানুষই মনে হয়। কিউবায় সঙ্কটে দুই মহাশক্তি যথেষ্ট টানটান উত্তেজনা সত্ত্বেও মাত্র ১৩ দিনের মধ্যে যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিয়ে সঙ্কটের সমাধান সূত্র বার করতে সমর্থ হয়েছিল। বিশ্বের মানুষ মুক্তির নিশ্বাস ফেলেছিল। আমরা জানি, মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়াতে কিউবাগামী জাহাজগুলির গতিমুখ পরিবর্তন করে রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞার পরিচয় রেখেছিল সোভিয়েত নেতৃত্ব। প্রত্যুত্তরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত নৌবহর অন্যত্র সরিয়ে নিয়েছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় তদানীন্তন নেতৃত্ব তুরস্ক থেকে পরমাণু অস্ত্রে সজ্জিত মিসাইল ঘাঁটিও স্থানান্তরিত করেছিল।

পাশাপাশি আজকের পরিস্থিতিটা পর্যালোচনা করা যেতে পারে। আজ পারমাণবিক মহাশক্তি রাশিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও পর্দার আড়ালে থেকে যতরকম বজ্জাতি করা সম্ভব করে চলেছে। জো বাইডেন রাষ্ট্রপতির ভাষণে বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে সদম্ভে ঘোষণা করেছেন, রাশিয়াকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য যা কিছু করা সম্ভব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাই করবে। পশ্চিমী শক্তিশালীও বড়দাকে তোয়াজে রাখার জন্য সুরে সুর মিলিয়ে তবলাসঙ্গত করে চলেছে, যেভাবে মার্কিন শক্তি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাশিয়ার উপর সার্বিক নিষেধাজ্ঞার চাপ বাড়িয়ে চলেছে তা মূলত সরাসরি যুদ্ধেরই নামান্তর মাত্র। এমন কথাই বলেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমী শক্তিগুলির সর্বাত্মক অর্থনৈতিক যুদ্ধ ঘোষণার জবাবে রাশিয়াও যুৎসই পাল্টা আক্রমণ হানতে দ্বিধা করবে না। এমনকি, রাশিয়ার পারমাণবিক সমরসজ্জাও সম্পূর্ণ প্রস্তুত—পুতিনের হুঁশিয়ারিকে মান্যতা না দেওয়াটা অবশ্যই অবিবেচকের কাজ।

এদিকে পশ্চিমী শক্তিগুলি ইউক্রেনে অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র সরবরাহ করে চলেছে। রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ বলেছেন, সামরিক অস্ত্র বোঝাই ইউক্রেনেমুখী যে কোনো জাহাজই রাশিয়ার আইনসঙ্গত আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হবে।

মনে হয় যেন, জো বাইডেন এবং তাঁর যোগ্য সাগরেদ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন কোমর বেঁধেই রাশিয়ার সঙ্গে ভয়ঙ্কর এক সম্মুখ সমর শুরু করতে চলেছে। জো বাইডেন কোনো রাখঢাক না রেখেই রাশিয়ায় শাসক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলার পাশাপাশি পুতিনকে একজন যুদ্ধপরাধী বলতেও ইতস্তত করেননি। রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞার কথা না তোলাই ভাল, কিন্তু বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর রাষ্ট্রের প্রধান যে, ইতর ভাষায় প্রতিপক্ষকে লাগাতার আক্রমণ করে চলেছে তা সত্যিই তুলনাহীন। এভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে এক জটিল পরিস্থিতিকে জটিলতর করে তুলতে জো বাইডেন বেশ নিম্নমানের পারদর্শিতারই পরিচয় রেখেছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড এবং আরও কয়েকটি দেশ যে সব অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র ইউক্রেনকে সরবরাহ করে চলেছে সেগুলি রাশিয়ার সামরিক শক্তির উপর মারাত্মক আঘাত হানতে সক্ষম। পাশাপাশি, আমেরিকার গোয়েন্দা দপ্তরকেও যথেষ্ট সক্রিয় করে তোলা হয়েছে এবং লন্ডনও রাশিয়ার অভ্যন্তরে আঘাত হানার জন্য ইউক্রেনকে ক্রমাগত প্ররোচিত করছে। রাশিয়াও পাল্টা আক্রমণে প্রবৃত্ত হলে সর্বনাশের আর কিছুই বাকি থাকবে না। যুদ্ধের ভাষায় যাকে বলা হয় Preemptive strike.

প্রসঙ্গত ২০০৩ সালে ইরাক অভিযানের সময় তদানীন্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশও ইরাক অভিযানকে Preemptive military action বলেই অভিহিত করে বলেছিলেন আমরা যুদ্ধটাকে শত্রুর দোরগোড়ায় নিয়ে গিয়ে তাদের সব পরিকল্পনা তছনছ করে দেবো, যাতে শত্রু আক্রমণ হানার কোনো সুযোগই না পায়।

বর্তমান সময়কালে মস্কোর এই নীতিকে (Doctine) মান্যতা দিয়ে একই পথ অনুসরণ করে ন্যাটো জোটভুক্ত দেশগুলির অস্ত্র সম্ভারের উপরও শব্দের চেয়েও দ্রুতগামী মিসাইল (Hypersonic Missile) আক্রমণ হানতে পারে। এমনকি, ইউক্রেনেও কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র (Tactical Nuclear Weapons) ব্যবহার করতে পারে।

পশ্চিমী জোটের জুয়া খেলাটা এই খানেই যে, রাশিয়া এমন সব মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করবে না, শেষমেষ আক্রমণের চাপ সহ্য করতে না পেরে যুদ্ধের ময়দান ছাড়তে বাধ্য হবে। রাশিয়ান মানসিকতার সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে তারা জানে এমন কল্পনা বাস্তবোচিত নয়।

যে চুক্তি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হিরোশিমা-নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা ফেলেছিল, যে যুক্তিতে কোরিয়া বা ভিয়েতনামে পরাজয়ের মুখে পরমাণু বোমার ব্যবহারের কথা ভেবেছিল, সেই একই যুক্তি আজকের রাশিয়াও অনুসরণ করতে পারে না কি! যাই হোক, পুতিন একজন মহান রাষ্ট্রনায়ক (Statesman)। এমন দাবি তার পরম মিত্রও করবে না বলেই মনে হয়।

অনেকেই পুতিন সম্বন্ধে ভুল ভাবনাচিন্তা করেছিলেন, ন্যাটো বাহিনীর পূর্বদিকে অগ্রগমনের বিরুদ্ধে পুতিনের হুঁশিয়ারিকে পশ্চিমী শক্তি কোনও গুরুত্বই দেয়নি। বিদেশমন্ত্রী লাভরভ একাধিক বার বলেছেন, ন্যাটো জোটের ক্রমাগত পূর্বদিকে এগিয়ে যাওয়ার রণকৌশল রাশিয়ার কোনোভাবেই মেনে নিতে পারবে না। কোনো ফল হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমী শক্তিগুলির রাজনৈতিক অবিমৃষ্যকারিতার ফলশ্রুতিতে আজকের এই অভাবনীয় সঙ্কট। ইউক্রেন সঙ্কটের ঘোলা জলে মাছ ধরতে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা শক্তিগুলি যে ছায়াযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, তার পরিণতি ভয়ঙ্কর হতে পারে এবং অবিলম্বে এই ছায়াযুদ্ধ বন্ধ করা প্রয়োজন। মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা এই দায়িত্ব মানব সভ্যতা রক্ষার খাতিরে অস্বীকার করতে পারে না।

সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো আসছে মামলা এই বাংলায়

সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো একের পর এক মামলার দায়িত্ব এসে পড়ছে সিবিআই-এর হাতে। তদন্তকারী অফিসারকুল, আইনজীবিরা কিছুটা বেসামাল। মামলার তালিকা এই প্রকার। (১) সারদা রোজভ্যালি সহ ৪৭টি বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থার বিরুদ্ধে মামলা, (২) নারদা স্টিং অপারেশন, (৩) কয়লা পাচার, (৪) গরু পাচার, (৫) ভোট পরবর্তী হিংসা (৭২), (৬) হলদিয়া বন্দরে কয়লা পাচারে দুর্নীতি, (৭) রামপুরহাটে বগটুই হত্যাকান্ড, ভাদু শেখ হত্যাকান্ড, (৮) ঝালদায় তপন কান্দু খুন, (৯) নদিয়ার হাঁসখালিতে নাবালিকা গণধর্ষণ, নারকীয় অত্যাচার ও মর্মান্তিক মৃত্যু, (১০) মালদায় কালিয়াচক থানার ওসি'র বিরুদ্ধে ধর্মান্তকরণের অভিযোগ, (১১) হেরিটেজ সম্পত্তিতে প্রাক্তন মেয়র শোভনদেব এবং শিল্পী শুভাপ্রসন্নের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা। (১২) রাজ্যে নানা দুর্নীতি সংক্রান্ত আরও প্রায় ৯০টি মামলা। (১৩) এস এস সি সহ শিক্ষাক্ষেত্রে চারটি মামলা, (১৪) জ্ঞানেশ্বরী রেল দুর্ঘটনা সূত্রে রেলে নিয়োগ সম্পর্কিত মামলা।

ত্রিপুরা সংবাদ

আগামী সেপ্টেম্বরে আর এস পি ত্রিপুরা রাজ্য সম্মেলন সংগঠিত করার লক্ষ্য নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ব্রাঞ্চ ও অঞ্চল সম্মেলনের কর্মসূচি চলছে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে ১০ জুন বিকাল পাঁচটায় উদয়পুর রাজারবাগে অনুষ্ঠিত হয় আর এস পি উদয়পুর শহর ব্রাঞ্চ সম্মেলন। নতুন সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হন কম. দেবদুলাল চক্রবর্তী এবং কম. প্রসেনজিৎ ভৌমিক।

১৮ জুন বিকাল পাঁচটায় বৈষ্ণবীচরে আর এস পি জামজুরী খিলপাড়া ব্রাঞ্চ সম্মেলন সংগঠিত হয়। সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হন কম. ময়নাল হোসেন ও কম. আমান মিঁয়া। ১১ জুন সন্ধ্যা ছ'টায় মুড়াপাড়াতে মুড়াপাড়া অঞ্চল সম্মেলন হয় এবং ১৮ জুন সন্ধ্যা সাতটায় বৈষ্ণবীচরে আর এস পি উদয়পুর শহর অঞ্চল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মুড়াপাড়া অঞ্চল সম্পাদক হন কম. সঞ্জয়প্রসাদ ধর। উদয়পুর শহর অঞ্চল সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হন কম. শ্রীকান্ত দত্ত ও কম. দীপক দেব।

সম্মেলনগুলোতে নেতৃত্ব ও বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আর এস পি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথা ত্রিপুরা রাজ্য ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক কম. দীপক দেব এবং রাজ্য কমিটির সদস্য গোমতী জেলা সম্পাদক কমরেড ভানু লোধ, রাজ্য কমিটির সদস্য কম. শ্রীকান্ত দত্ত এবং দেবদুলাল চক্রবর্তী প্রমুখ নেতৃত্ববৃন্দ।

অঞ্চল ও ব্রাঞ্চ সম্মেলনের বক্তারা সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের সামনে বলেন, আমাদের দেশ ও রাজ্য আজ গভীর সঙ্কটে। ধনিক শ্রেণির প্রতিভূ ফ্যাসিবাদী শোষক বিজেপি'র শাসনে ছাত্র, যুব, নারী, শ্রমিক, কৃষক, কর্মচারী, মেহনতী জনগণ সহ বেশিরভাগ দেশবাসী আজ দিশাহারা। পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস, কেরোসিন সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক হারে মূল্যবৃদ্ধির ফলে দেশবাসী আজ গভীর সঙ্কটে। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ম সঙ্কোচন নীতি এবং লাগামছাড়া কর্মহীন, বেকার বেসরকারিকরণ-এর ফলে যুব সমাজ আজ কাজহীন। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা থেকে শুরু করে দেশের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডগুলি বেসরকারি মালিকানার হাতে দিয়ে দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। ফলে সকল মানুষের শিক্ষা স্বাস্থ্য কাজের অধিকার আজ ভুলুণ্ঠিত। লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাও আজ বেসরকারি মালিকানায় দিয়ে দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। পাশাপাশি ত্রিপুরা রাজ্যের বিজেপি আই পি এফ টি জোট সরকারের চার বছরের শাসনেও রাজ্যবাসী ত্রস্ত ও বিরক্ত। জনগণের মতপ্রকাশের অধিকার, আন্দোলন করার অধিকারও ছিনিয়ে নিয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের শোষিত জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সঠিক পথ দেখাতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে সমজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমেই শোষিত জনগণের মুক্তি সম্ভব। সেই লক্ষ্যে বামপন্থীদের আশু কর্মসূচি হিসেবে শাসনক্ষমতা থেকে বিজেপিকে সরিয়ে বাম গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর এস পি দলের কর্মীগণ সেই লক্ষ্যে এগিয়ে যাবেন বলেই বক্তাগণ আশা ব্যক্ত করেন।

চা বাগানের শ্রমিকদের চিঠি

মুখ্যমন্ত্রী কি জানতেন না, তাঁরই সরকারের শ্রমমন্ত্রীর নেতৃত্বে অনেকগুলো বৈঠকের পর চা-বাগানের মালিকরা সময় চেয়ে নিয়েছিলেন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করার জন্য। আমরা চা-বাগানের শ্রমিকরা বুঝতে পারছিলাম মালিকরা চাপে আছে। শ্রমিকরাও বুঝতে পারছিল এবার একটা ফয়সালা হতে পারে। এই রকম একটা পরিস্থিতির সময় মুখ্যমন্ত্রীর ১৫ শতাংশ বর্ধিত মজুরির ঘোষণা মালিকদের পক্ষে গেল না কি? পরবর্তী ঘটনাগুলি দেখে আমরা শ্রমিকরা বুঝে গেছি সবটাই পূর্ব পরিকল্পিত। সাথে সাথে মন্ত্রীমশাই ঘোষণা করলেন, ''মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মতো শ্রম দপ্তর থেকে নির্দেশ চলে যাবে। 'টি এম সি'র চা বাগানের নেতারা উক্ত ঘোষণার সমর্থনে বাগানে গেট মিটিং-এ নেমে গেলেও শ্রমিকরা উৎসাহ দেখাল না। আমাদের ডুয়ার্স চা বাগান ওয়ারকার্স ইউনিয়ন সিদ্ধান্ত নিল, এহেন শ্রমিক বিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পরের দিন থেকেই গেট মিটিং করা হবে। তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন বাদে, বাকি সমস্ত সংগঠনকে অনুরোধ করা হয়েছিল গেট মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করার জন্য। জয়েন্ট ফোরামের আহ্বায়ককে অনুরোধ করা হলো মিটিং ডাকার জন্য। গেট মিটিং এ অভূতপূর্ব সাড়া মিললো। এখনও প্রচার আন্দোলন চলছে। জয়েন্ট ফোরামের নেতৃত্বে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। আমরা চা বাগানের শ্রমিকরা বুঝে গেছি, এই আন্দোলনের বৃহত্তর চেহারা নেবে ও দীর্ঘমেয়াদী হবে। আমরা জানি, আলিপুরদুয়ার জেলা সহ সমগ্র ডুয়ার্সের আর্থিক অবস্থা নির্ভর করে চা-বাগানের শ্রমিকদের বেতনের ওপর। সমস্ত ব্যবসায়ী সংগঠন ও সর্বস্তরের জনসাধারণের সহযোগিতা আমরা চেয়েছি। তার প্রচারও শুরু হয়েছে।

সুভাষ লোহার, চা বাগানের শ্রমিক।

Printed and published by Manoj Bhattacharya from Kranti Press, 37 Ripon Street, Kolkata-700 016, Editor : Manoj Bhattacharya of behalf of RSP (Website : www.ganavarta.com)
Price Rs. 5/-